দাম : দশ টাকা

বেদে গো-হত্যা বা গো-মাংস ভক্ষণের নির্দেশ নেই
পৃ: ১৩

স্বস্তিকা

চীনকে টেক্কা দিতে খুটি সাজাচ্ছে ভারত
পৃ: ২৯

৬৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ৩০ নভেম্বর ২০১৫।। ১৩ অগ্রহায়ণ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

গো-মাংস ভক্ষণের পক্ষে যুক্তি কি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা নয়?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৩০ নভেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : ...হাতে হাতে ধরি ধরি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনকে উৎখাতের যুদ্ধে বিশ্ব এখন একজোট ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

টিপু সুলতানের 'রক্তাক্ত' তরবারি ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ১১

বেদে গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণের নির্দেশ নেই ▯ ড. সীতানাথ গোস্বামী ▯ ১৩

কোচবিহারের মদনমোহনদেবের রাসমেলা ▯ সুজিত চক্রবর্তী ▯ ২১

ঘটোৎকচ-জননী হিড়িম্বা ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

একই দলের মধ্যে অনাবশ্যক বহুমাত্রিক আওয়াজ শুধু রাজনৈতিক বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

চীনকে টেক্কা দিতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে ভারত ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৯

অক্লান্ত যোদ্ধা অশোক সিংহল ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮** ▯ **খেলার জগৎ : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিদেশে স্বদেশের নিন্দা কি সহিষ্ণুতা?

ভারতে যখন সন্ত্রাসবাদের আক্রমণে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, নিত্য পাকিস্তান থেকে আগত জঙ্গিরা এদেশে হানা দিচ্ছে; সেদেশে বসেই চলেছে ভারত-বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র, তখন এদেশের প্রাক্তন এক বিদেশমন্ত্রী এবং এক কংগ্রেসী প্রাক্তন মন্ত্রী পাকিস্তানে গিয়ে সন্ত্রাস নিয়ে সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করছেন। নিন্দা করছেন নিজ দেশের সরকারের ও প্রধানমন্ত্রীর। এরই নাম কি সহিষ্ণুতা? বুদ্ধিজীবীরা এই দেশদ্রোহীতায় নীরব কেন? এই নিয়েই এবারের বিষয়। লিখেছেন মেঃ জেঃ (অবঃ) কে কে গাঙ্গুলি, অমলেশ মিশ্র প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

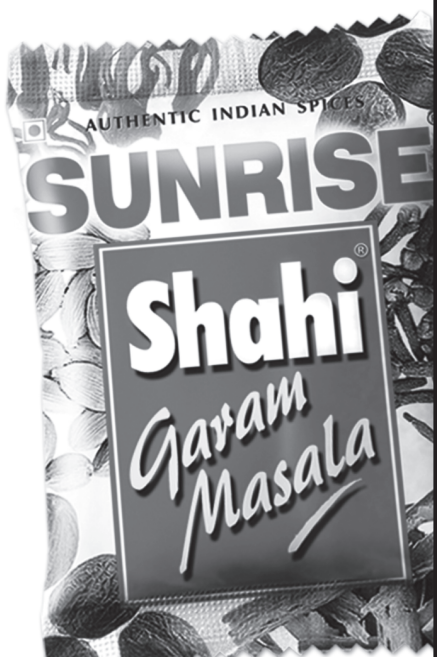

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসের ইন্ধন যখন ঘরেই

প্যারিসের সন্ত্রাসের ঘটনায় সেই দেশের মুসলমান জনসাধারণের ইন্ধন ছিল বলিয়াই এখনও পর্যন্ত জানা যাইতেছে। ঘর শত্রু বিভীষণ না থাকিলে প্যারিসে এই জঙ্গি হামলা সম্ভব হইত না। আমাদের দেশেও সন্ত্রাসী হামলায় বিভীষণদের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া সব চাপা দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হইবার পরেও এই দেশে ইসলামি সন্ত্রাস বন্ধ হয় নাই, কারণ এই দেশে বসিয়াই কিছু কুলাঙ্গার এই ইসলামি সন্ত্রাসকে ইন্ধন জোগাইতেছেন। পাকিস্তান হইতে প্রত্যহ এই সন্ত্রাসকে যেমন মদত যোগানো হইতেছে তেমন এই দেশে তাহাতে ইন্ধন জোগাইতেছেন কয়েকজন পাকিস্তানি দালাল। এই দেশেই লালিত পালিত হওয়া দুই দেশোদ্রোহী সলমন খুরশিদ এবং মণিশঙ্কর আইয়ার পাকিস্তানে গিয়া পাকিস্তানের গুণকীর্তন করিয়া বরঞ্চ ভারতকেই সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করিয়াছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিয়া পাঞ্জাবে আবার সন্ত্রাস চালাইবার প্রস্তুতিতে উস্কানি দেওয়া হইতেছে। গত ১০ নভেম্বর অমৃতসরে সরবত খালসা নামক শিখদের একটি ধর্মীয় সম্মেলনে পৃথক খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করা হইয়া থাকে। এই সম্মেলনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং রাহুল গান্ধী নিজে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে কংগ্রেস বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনে দেশ অস্থির করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেশে হিন্দু নেতাদের খুন করিয়া দাঙ্গা বাঁধানোর ছক করিতেছে আই এস আই এবং সেই কর্মে কংগ্রেস তাহাদের সমর্থন করিতেছে। পাকিস্তানে গিয়া সলমন খুরশিদ এবং মণিশঙ্কর আইয়ার আই এস আই'র সহিত এই কারণের মিলিত হইয়াছিলেন। এই প্রক্রিয়ার ফলেই গত ২ নভেম্বর গুজরাটের ভারুচ জেলার বিজেপির দুই নেতাকে গুলি করিয়া হত্যা করে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারী। উল্লেখ্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই ভারতে বিশিষ্ট বিজেপি ও আর এস এস কার্যকর্তাদের হত্যা করিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাইবার চেষ্টায় রত। দুই দেশেই সেই প্রস্তুতি শুরু হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের কাগজে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইতেছে যে ভারতে নাকি মুসলমানদের প্রতি প্রবল অত্যাচার চলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দেশেও অসহিষ্ণুতা লইয়া একই নাটক চলিতেছে। কেবল নরেন্দ্র মোদীকে জব্দ করিবার জন্য এই জঘন্য বিপজ্জনক খেলা শুরু হইয়াছে। 'নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ' ইহাকেই বলে।

আমাদের বাংলায়ও মুসলমান মৌলবাদী শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ায় আই এস আই পোস্টার মারিতেছে, হাওড়ায় আই এস জঙ্গি ধরা পড়িয়াছে অথচ তৃণমূল সরকার এই বিষয়ে নিশ্চুপ। রাজ্যপুলিশ প্রমাণ নষ্ট করিতে তৎপর। ইতিপূর্বে বর্ধমান কাণ্ডেও রাজ্যপুলিশ বহু প্রমাণ লুপ্ত করিয়াছে। রাজ্য সরকারের ইচ্ছাতেই পুলিশের এই উদ্যোগ। তৃণমূল সরকারের সহিত ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের যে যোগসূত্র রহিয়াছে তাহা আজ সকলেই অবগত। নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির নেতা তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য। বর্তমানে অপর বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সঙ্গে তৃণমূলের যোগ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরেও ধর্মনিরপেক্ষতা অসহিষ্ণুতা লইয়া ভণ্ডামি করা কিসের জন্য?

সুভাষিতম্

গায়ন্তি দেবাঃ কিলগীতকানি
ধন্যাস্তুতে ভারতভূমি ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।।

ভারতভূমিধন্য, দেবতারা স্বর্গ ও মোক্ষলাভের জন্য ভারতভূমিতে দেবত্ব ত্যাগ করে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেন—দেবতারা এইরূপ গান করে থাকেন।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্মেলন চায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অতি সম্প্রতি প্যারিসে ও বেইরুটে দু'টি নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হানার পরিপ্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ওপর চাপ বাড়াল ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের ডেপুটি স্থায়ী প্রতিনিধি ভগবন্ত বিঞ্চোইয়ের বক্তব্য : 'প্যারিস ও বেইরুটে সন্ত্রাসবাদী হামলা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে শান্তি ও নিরাপত্তা আজ চরম বিঘ্নিত। হিংস্র উগ্রপন্থা এবং ধর্মীয় চরমপন্থা যে কত মারাত্মক হতে পারে গোটা বিশ্বই এখন তা উপলব্ধি করতে পারছে।' তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে ২০০৫ সালে শিখর সম্মেলনে বিশ্ব নেতারা একজোট হওয়ার কথা বললেও তা কার্যে পরিণত হয়নি। অসংখ্য নিরীহ মানুষের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমরা তার মাসুল গুনছি বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ভগবন্ত বিঞ্চোই

কূটনীতিবিদরা মনে করেন এধরনের সম্মেলনের আয়োজনের অন্য তাৎপর্য রয়েছে। কারণ রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন যেমন মন্তব্য করেছেন এই সন্ত্রাসবাদ কিছু রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট, তেমনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আহ্বান জানিয়েছেন জঙ্গিদের অর্থের যোগান বন্ধ করতে হবে। বিঞ্চোই মনে করেন, সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যেমন দায়েশ, কিংবা আল শাবাব বা লস্কর-ই-তৈবা অথবা আল কায়েদার মতো সংগঠনগুলি কেবল জঙ্গি আদর্শবাদের ভরসায় টিকে নেই। তাদের কাছে আশ্রয় এবং অর্থের নিশ্চিত জোগান আছে বলেই তারা সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে পারছে। সুতরাং সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হলে সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা রাষ্ট্রগুলিকে চেপে ধরার মোক্ষম সুযোগ পাবার সম্ভাবনা থাকবে বলে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। বলাই বাহুল্য, ভারতের ক্ষেত্রে সুযোগ থাকবে পাকিস্তান কিংবা চীনের মতো দেশকে বিশ্বের দরবারে অস্বস্তিতে ফেলার। সবথেকে বড়ো কথা এই সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা সন্ত্রাসবাদের পক্ষে, আর কারাই বা বিপক্ষে।

এছাড়াও বিঞ্চোই আরও মনে করছেন আর্থিক ও সামাজিক অবনমনের দোহাই দিয়ে অনেক সময়েই সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করা হয়, যা কোনোমতেই কাম্য নয়।

আইসিসের নিশানায় উত্তরবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আইসিস জঙ্গিদের নজর এবার উত্তরবঙ্গে— কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্টে এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে সূত্র মারফৎ জানা যায়। গত ১৩ নভেম্বর ফ্রান্সে ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটায় আইসিস। আর তারপরই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ২৬/১১-এর ধাঁচে ফ্রান্সে হামলা চালাবার পর শিলিগুড়িতে ঘাঁটি গেড়ে উত্তরবঙ্গের সাত জেলার পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং নেপালেও জাল বিস্তারের কাজ শুরু করেছে সিরিয়ার এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন— এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা জানানো হলেও উত্তরবঙ্গ প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'এরকম কোনো খবর নেই' বলে জানানো হয়। এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের দুই এজেন্ট শিলিগুড়ি শহরে বসবাস করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে এই খবর পাওয়া মাত্রই রাজ্য পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থা নড়েচড়ে বসে। মূলত নজর রাখা হয়েছে মালদা, শিলিগুড়ির ওপর। কারণ শিলিগুড়ি হচ্ছে জঙ্গিদের কাছে সুখের আস্তানা। শিলিগুড়িকে কাজে লাগিয়ে নেপাল, ভুটানে গা ঢাকা দেওয়া সম্ভব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা যায়, শিলিগুড়িকে ঘাঁটি করে মালদা থেকে কোচবিহার এই সাত জেলা থেকে কমবয়সি ছেলেদের বুঝিয়ে নেপাল হয়ে মায়ানমারে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো এবং বাংলাদেশে যে আইসিস জঙ্গিরা রয়েছে তাদের এজেন্ট মারফৎ মালদা শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পাঠানো। সেখান থেকে অন্য একটি দল মায়ানমারে পৌঁছে দেবে। যা শুনে এরাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। গোপনসূত্রে জানা যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছ থেকে ফ্যাক্সবার্তা পাওয়ার পরই অপারেশনে হাত লাগিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। শিলিগুড়িতে থাকা দুই এজেন্টের নম্বর সংগ্রহ করে তাদের ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে পুলিশ। জানা যায়, দুই এজেন্টের প্রধান কাজ হচ্ছে সপ্তাহের তিন-চারদিন বিভিন্ন জেলায় গিয়ে বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক পরিবার,বেকার যুবকদের মোটা অঙ্কের টাকার লোভ দেখিয়ে কাজে পাঠানোর নামে দলে টানার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে তাদের প্রচুর টাকা এবং ভারতে স্থায়ী বাসস্থানের টোপ দিয়ে মায়ানমারে পাঠানো হচ্ছে। গোয়েন্দাসূত্রে জানা যায়, শিলিগুড়িতে বসবাসরত দুই এজেন্ট বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই আইসিস জঙ্গি শিবিরে পাঠিয়েছে। তাই এই দুই এজেন্টকে ধরতে জাল বিস্তারে ব্যস্ত পুলিশ প্রশাসনও।

সলমন, মণিশঙ্করের দেশবিরোধী মন্তব্যের তীব্র নিন্দা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার এবং সলমন খুরশিদকে দেশবিরোধী মন্তব্যের জন্য তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল বিজেপি। গত ১৭ নভেম্বর নতুন দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ ও দলের মুখপাত্র মীনাক্ষী লেখী বলেন, মণিশঙ্কর কিংবা সলমন আই এস জঙ্গি সংগঠন, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই এবং তালিবানের মুখপত্রের কাজ করছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের 'দুনিয়া টিভি'তে একটি প্যানেল আলোচনায় মণিশঙ্কর মন্তব্য করেন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা শুরু করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করতে হবে। এর জন্য 'আমাদের আরও চার বছর অপেক্ষা করতে হবে' বলেও অনভিপ্রেত বক্তব্য রাখেন তিনি। স্বভাবতই পাকিস্তানের টিভি চ্যানেলে এ ধরনের মন্তব্য করে দেশকে তিনি কতটা অপদস্থ করার চেষ্টা করলেন সে প্রশ্ন উঠে যায়। শুধু তাই নয়, প্যারিসে সন্ত্রাসবাদী হানার ক্ষেত্রেও তিনি মন্তব্য করেন— 'পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে ইসলাম-বিরোধী মানসিকতা চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। ফ্রান্সে যে মুসলমানরা বসবাস করছেন, তাঁদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা দরকার। যেহেতু তাঁরাও সে দেশের নাগরিক।' মণিশঙ্করের এহেন অযাচিত জ্ঞান দানে স্বাভাবিকভাবেই ভারত-ফ্রান্স বৈদেশিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন কূটনীতিজ্ঞরা। বিশেষ করে ফ্রান্সে যখন সাধারণ মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কোনো ঘটনাই ঘটেনি, সেখানে এহেন অবাঞ্ছিত মন্তব্য ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের খুঁটিই শক্ত করবে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অন্যদিকে গত ১২ নভেম্বর ইসলামাবাদে জিন্না ইনস্টিটিউটে গিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভূয়সী প্রশংসা তো করেনই। একইসঙ্গে বলে বসেন, 'নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নওয়াজ সাহসী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সফরের পরই আমাদের পক্ষে এমন কিছু বলা ও করা হয়, যা পাকিস্তানের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।' সঙ্গতকারণেই খুরশিদের এই মন্তব্য ভারতে পাক-পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গিদের উৎসাহিত তো করেই, এমনকী দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড়োসড় চ্যালেঞ্জের জন্ম দেবে বলেও সমর বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সেই সঙ্গে ঘরের কোন্দলকে যেভাবে বাইরের হাটে বেচে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছেন এই দুই কংগ্রেস নেতা, তাতে ভারতেরই বিশ্বের দরবারে মাথা নত হলো বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যখন পাক-প্রধান নওয়াজ শরিফ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে 'দেহাতি মহিলা' বলে কটাক্ষ করেছিলেন, তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার প্রতিবাদ করেছিলেন। লেখীর অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ন যজ্ঞ-কে বিপথে চালিত করতেই কংগ্রেস তাদের এই দুই নেতাকে দিয়ে ভারত-বিরোধী মন্তব্য করাচ্ছে। এদেরকে 'নির্লজ্জ' আখ্যা দিয়ে শ্রীমতী লেখী আরও বলেন, এরা যেভাবে ইসলামাবাদে আই এস আই-এর প্রধান দপ্তর ভ্রমণ করেছেন তাদের সফরে, তাতে জঙ্গিরাই উৎসাহিত হবে। লেখীর বক্তব্য : 'সলমন খুরশিদ ও মণিশঙ্কর আইয়ারের কার্যকলাপে ভারতবর্ষ ও ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাই অপমানিত হচ্ছেন।' বিজেপি মুখপাত্রের এও মন্তব্য : 'বিজেপি কংগ্রেসের এধরনের ঘৃণিত দেশ বিরোধিতার তীব্র নিন্দা করছে এবং এব্যাপারে কংগ্রেসের জবাবদিহি দাবি করছে। আমরা সারা বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতে এধরনের ক্ষতিকারক বস্তুগুলির ওপর সতর্ক নজর রাখছি।'

সংস্কৃত ভাষা প্রচারে উদ্যোগী মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংস্কৃত ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৩ সদস্যের একটি প্যানেল কমিটি গড়ে দিলেন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং বর্তমানে তিরুপতির রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের আচার্য এন গোপালস্বামীকে এই প্যানেলের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের সাহায্যে শিক্ষার অন্যান্য শাখা যেমন— পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং আইনকে সুসংহতভাবে কীভাবে অধ্যয়ন করা যায় তারই দিশা দেখাবে এই কমিটি। এছাড়াও বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যেভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয় তার পরিবর্তন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষাদানের পদ্ধতি সুপারিশ করার দায়িত্ব রয়েছে এই কমিটির উপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্মৃতি ইরানীর ভারতীয় ভাষাগুলিকে নিয়ে গঠিত এটি দ্বিতীয় কমিটি। প্রথম প্যানেলটির উদ্দেশ্য ছিল ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষাগুলির প্রসার (promotion) আর দ্বিতীয়টি হলো কেবলমাত্র সংস্কৃত নিয়ে। এই প্যানেলের অন্যান্য সদস্য, সদস্যারা হলেন নীতি আয়োগের সদস্য বিবেক দেবরায়, প্রাক্তন ভারত সচিব ভি ভি ভট্ট, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. রামা দোরাই, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমেশ ভরদ্বাজ, ইউ জি সি চেয়ারম্যান বেদ প্রকাশ এবং সংস্কার ভারতীর কৃষ্ণা শাস্ত্রী।

দিল্লীতে প্রয়াত অশোক সিংহলজীর স্মরণসভা

রামমন্দির নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগই হবে সিংহলজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যদি আমরা অশোকজীকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তাহলে তাঁর সংকল্পকে পূরণ করার জন্য আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে। রামমন্দির নির্মাণে আমাদের বিশেষভাবে উদ্যোগ নিতে হবে এবং সেটাই হবে অশোকজী সিংহলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন। অশোকজীর প্রয়াত আত্মা আমাদের এই কাজে পথনির্দেশ করবে। গত ২২ নভেম্বর দিল্লীতে এক স্মরণসভায় একথা বলে প্রয়াত অশোক সিংহলজীকে শ্রদ্ধা জানান সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত। তিনি বলেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর রামমন্দির নির্মাণের স্বপ্নকে আমরা সফল করব। এই প্রসঙ্গে এমাসেরই প্রথম দিকে সিংহলজীর সঙ্গে তার শেষ সভার কথাটিও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। সেখানে শ্রীভাগবত ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর উপস্থিতিতে সিংহলজী অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করার উপর জোর দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এই সভায় শ্রী সিং বলেছিলেন, স্বাধীন ভারতে দু'টি বিশাল আন্দোলনের মধ্যে একটি হলো রামজন্মভূমি আন্দোলন। এদিনের সভায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহও স্বাধীনোত্তর ভারতে বৃহত্তম 'রামমন্দির আন্দোলন'-এর রূপকার হিসেবে উল্লেখ করে অশোক সিংহলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, ডাঃ হর্ষবর্ধন, বেঙ্কাইয়া নাইডু, সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি, ড. মুরলীমনোহর যোশী, বিষ্ণুহরি ডালমিয়া, প্রবীণ তোগাড়িয়া প্রমুখ।

ড. যোশী বলেন, রামই ভারত, ভারতই রাম। রামমন্দির নির্মাণ ছাড়া অশোকজীর স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। আমরা স্পষ্ট করেই বলতে চাই, ভারত একদা বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আবার সেই স্থান গ্রহণ করবে। রামমন্দির নিয়ে যাঁরা বিতর্ক তৈরি করতে চায় তারা আমাদের পরম্পরার বিরোধী। রামমন্দির নির্মাণ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বরাবরই আইন তৈরির দাবি জানিয়ে আসছে। ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া বলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য কেন্দ্র সরকারের সংসদে আইন তৈরি করা উচিত। সিংহলজীর প্রতি এটাই হবে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন। অশোকজীর প্রয়াণে আমরা শোক পালন করেই থেমে থাকব না, বরং হিন্দু বিজয় হিসেবে উদযাপন করব।

কেজরীওয়ালের আদর্শবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অক্টোবর ২০১৩ সালে দিল্লী নির্মাণের প্রাক্কালে দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি করার স্লোগান দিয়েছিলেন বর্তমান দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। তাঁর নীতিবোধকে প্রতিষ্ঠা দিতে ও ভারতীয় রাজনীতিতে ভ্রষ্টাচারের রমরমা বোঝাতে তাঁর প্রিয় টার্গেট ছিল আরজেডি দলনেতা লালুপ্রসাদ যাদব। সেই সময় লালুর সাজা উপলক্ষে কেজরীওয়াল বলেন ''Laloo made crores in fodder scam. But no order for recovery of that money. Just 25 lakh fine and five years in jail. A sweet deal.''

লালু পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। তাকে মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আর ৫ বছরের জেল দিয়ে ছাড়া হলো। টাকাটা কেন উদ্ধার করা হলো না? কি চমৎকার ডিল হয়ে গেল।

তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশ কুমারের শপথের দিন তিনি নিজেই দিয়ে দিলেন। দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত লালুকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। হাজার ক্যামেরার ঝলকানিতে খুলে পড়ল তাঁর ভণ্ডামির মুখোশ।

দেখে শুনে মাথা হেঁট হয়ে গেল আপ দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রবাদপ্রতিম আইনজীবী শান্তিভূষণের। তিনি দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন কেজরীওয়ালের নেতৃত্বে 'আপ' আজ 'খাপ'-এ পরিণত। এই দলের আর বিন্দুমাত্র নৈতিক মূল্যবোধ অবশিষ্ট নেই।

...হাতে হাতে ধরি ধরি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী
নবান্ন, হাওড়া

দিদি,

মৌর্য হোটেল থেকে হেঁটেই যাবেন এটুকু পথ। রাজি হয়ে গেলেন কেজরীওয়ালও। দু'জনে মিলে এরপর পয়দল নীতীশ কুমারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিকে। আচমকা এই সিদ্ধান্তে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছিল নিরাপত্তা বাহিনীও।

পলিটিক্যাল ড্রামায় পারদর্শী হিসেবে আপনাদের দু'জনেরই নাম আছে। তাই বেশ লাগল দৃশ্যটা। গান্ধী ময়দানে নীতীশের শপথ পর্ব শেষ হতেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে চা-চক্র। সেখানে আগেই এসে গেছেন রাহুল গান্ধী। রাহুল রয়েছেন তাই আবার কেজরীওয়াল অন্য রাস্তায়। তবে আপনার তাতে কোনো সমস্যা নেই। আপনাকে দেখে রাহুল নিজেই উঠে এলেন। তবে দিদি না পিসি পিসি বলে এগিয়ে এলেন সেটা জানা যায়নি। অনেকক্ষণ কথা অবশ্য হলো। কী কথা হলো, তা জানা গেল না। কিন্তু নীতীশ যখন মমতাকে কিছু খেতে অনুরোধ করলেন, কিছু না খেলে অন্তত ডাবের জল কিংবা ডায়েট কোক, তখন পাশে বসে থাকা রাহুল বললেন, আপনি (মমতা) শরীরের প্রতি যত্ন নিন। অন্তত ডাবের জল নিন। নীতীশ বললেন, মাঝখানে উনি পরিশ্রম করে আর হাঁটাহাঁটি করে আরও রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। এখন সেই তুলনায় ভাল। মমতা বললেন, রাহুলকে বরং ডায়েট কোক দিন। ও ডায়েট কোক খায়। রাহুল জোরে হেসে উঠে বললেন, এখন ছেড়ে দিয়েছি। আহা কী মধুর সম্পর্ক!

বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আপনি যে আসলে মোদী-বিরোধী হাওয়া গরম করতেই পাটনায় নীতীশ কুমার, লালুপ্রসাদের কাছে পৌঁছেছিলেন সেটা জানেন রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরিও। এসেছিলেন অরবিন্দ কেজরীওয়ালও, যিনি দু'বছর আগে লালুর দুর্নীতি নিয়ে প্রচারে-টুইটারে সরব ছিলেন। এমন নয় যে এখনই সবাই মিলে কোনো ফ্রন্ট তৈরি করে ফেললেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনা উস্কে দিচ্ছেন সকলেই। ঘরোয়া রসিকতায় বারবার আজ তারই প্রকাশ। সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনের আগে মোদী সরকারের বিরোধিতায় নিজেদের মধ্যে সমন্বয় কী করে বাড়ানো যায়, তাই নিয়েও কথা বলেছেন আপনারা।

বিহারের মহাজোটের পর এ বার কি জাতীয় রাজনীতিতেও কোনো ফ্রন্ট তৈরি হতে চলেছে? আপনি বলেছেন মানুষের ফ্রন্ট তৈরি হচ্ছে। পাটনায় আপনার সঙ্গে দেখা করলেন ডিএমকের শীর্ষ নেতা করুণানিধির পুত্র স্ট্যালিন ও দলের অন্য নেতা টি আর বালু। বেলা ১১ টায় সেই বৈঠকের পরে, দুপুর ১টায় ফের আসেন কেজরীওয়াল। তাঁদের বৈঠকে ফের এসে যোগ দিলেন স্ট্যালিন ও বালু।

চা-চক্রের পরে নীতিশের বাড়ি থেকে ফের হেঁটে দশ নম্বর সার্কুলার রোডে লালু-রাবড়ির বাড়িতে চললেন আপনি। সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম। ঠিক যেন বিজয়া দশমী সারতে যাওয়া। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। লালু-রাবড়ি, লালুর দুই ছেলে তেজস্বী-তেজপ্রতাপ তো আছেনই। লালু-রাবড়ির বাড়িতেও তাঁদের ছেলেমেয়ে, নাতি- নাতনিদের মধ্যে আপনাকে নিয়ে হুল্লোড় চলল চারা কেলেঙ্কারিতে জেল খাটা লালুর বাড়িতে। মমতাকে মাঝখানে বসিয়ে ছবিও তুললেন সকলে। এত কিছুর মধ্যেও অনুপস্থিত রইলেন মুলায়ম আর অখিলেশ। আপনার সঙ্গে এক সময় বেইমানি করেছিল মনে আছে। সেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়। তবে তিনি বলেছিলেন তিনি নাকি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। আমার মনে প্রশ্ন, এবার যাদের সঙ্গে দহরম মহরম করলেন তারাও সবাই আপনাকে বিশ্বাস করেন তো!

যাই হোক, আপনি তো সব বন্ধুদের কলকাতায় নিমন্ত্রণ করেছেন। তারা আসুন। আরও বৈঠক নাটক দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

— **সুন্দর মৌলিক**

ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনকে উৎখাতের যুদ্ধে বিশ্ব এখন একজোট

অবশেষে মুসলমান সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করলো রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র। এই ঘোষণা এক বছর আগে হলে প্যারিসের মানুষজনকে রক্তস্নান করতে হোত না। এর প্রয়োজন ছিল। ইসলামি মৌলবাদীরা অত্যাচার ও পাপের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করেছে অনেক আগেই। খলিফা মৌলানাদের বিশ্বাস ছিল যে বিশ্ব রাষ্ট্র জোট নিজেদের অনৈক্যের কারণে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে না। সমাজবাদী চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা ও ইউরোপ একযোগে সন্ত্রাসবাদীদের খতমের ডাক দেবে সত্যি এটা ভাবা যায়নি। প্যারিসে হামলার পর সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। একদা হিটলারের নাৎসিবাহিনীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত ইউরোপের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল গোটা বিশ্ব। তারপর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এবং ধনতান্ত্রিক আমেরিকা পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা চালিয়ে গেছে বেশ কয়েক দশক ধরে। সাম্প্রতিককালে রুশ বোমায় বিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে শরণার্থীর ঢল নামলে রাশিয়াকে শাপ শাপান্ত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বলতে চাওয়া হয় যে সন্ত্রাসবাদী অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ইরাক এবং সিরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে রাশিয়া।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জানতেন যে ইরাক ও সিরিয়ার তেলের খনির দখল এখন আই এস সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। তেলের আন্তর্জাতিক কালো বাজারে তেল বিক্রি করে সন্ত্রাসবাদীরা দৈনিক ৩০ লক্ষ ডলার উপার্জন করে। এই টাকায় বিপুল অস্ত্র কেনা হয় অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। এই সব তথ্য মার্কিন রাষ্ট্রপতির অজানা নয়। তিনি জানেন যে তেলের চোরাবাজার থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কেনে আমেরিকার বহুজাতিক তেল সংস্থাগুলিই। চোরা পথে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে অস্ত্র আসে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের কাছে। বিশ্বের যে

গূঢ় পুরুষের

কলম

৪০টি সংস্থা থেকে আই এসের কাছে অর্থ সাহায্য আসে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্থাই আমেরিকার। তাই বারাক ওবামা যখন বলেন তাঁর দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তখন হাসি পায়। ওসামা বিন লাদেন নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করলে প্রায় তিন হাজার মার্কিন নাগরিকের মৃত্যু হয়। এরই পরিণতিতে আফগানিস্তানে আমেরিকা তালিবান শাসন খতম করে এবং পরে পাকিস্তানে আত্মগোপন করে থাকা লাদেনকে হত্যা করে। এই সঙ্গেই আমেরিকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটাও শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ আমেরিকা বিশ্বকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করেনি। তার লড়াইটা ছিল প্রতিশোধের। বিশ্বের বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের মানুষকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য বারাক ওবামার দেশ কোনোদিনই লড়াই করেনি। সম্প্রতি মালি, তিউনিসিয়া, অঙ্কারা, সুজ, তুরস্কে ইসলামি জঙ্গিরা হামলা চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বারাক ওবামা এইসব হামলার নিন্দা করা ছাড়া সামরিক ব্যবস্থার কথা বলেনি।

তাই বলছি দেরিতে হলেও বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রই এখন বুঝেছে যে ইসলামি হামলা থেকে কেউই মুক্ত নয়। ইসলামে সমাজতান্ত্রিক দেশ বা পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মৌলবাদী এই ধর্মে আল্লার শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী সব দেশের মানুষই কাফের। তাদের বেঁচে থাকার অধিকারই নেই। এই সহজ সরল কথাটা বুঝতে অনেক দেরি হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফ্রান্সের আনা প্রস্তাবে সায় দিয়ে সর্বসম্মতভাবে বলা হয় যে গোটা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আই এস। এই ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনকে উৎখাত করার যুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের উচিত সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। প্রস্তাবের সমর্থনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আই এসের বিষ পৃথিবী থেকে দূর করতে আন্তর্জাতিক দুনিয়া জোট বেঁধেছে। কারণ, আই এসের হাত থেকে বিশ্বের কোনো দেশই আজ নিরাপদ নয়।' মনে রাখতে হবে যে ইরাক এবং সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা এখন আই এস জঙ্গিদের দখলে আছে। এইসব এলাকা থেকে জঙ্গিদের উৎখাত সহজ নয়। কারণ এরা রক্তবীজের ঝাড়। এদের ধ্বংস করতে গেলে প্রথমেই বাইরে থেকে আসা অর্থ ও অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। কথাটা বলা সহজ। কাজে নয়। এক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব আমেরিকার। কারণ অর্থ ও অস্ত্রের প্রধান কেন্দ্রগুলি সেখানের। এইসব মদতদার সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বারাক ওবামার সরকার এইক্ষেত্রে কতটা সদর্থক পদক্ষেপ নেয় সেটাই দেখার। গত চার বছরে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন সেখানকার চার লক্ষ মানুষ। অর্থাৎ বছরে এক লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে আই এস। এরপরেও আমরা নীরব থেকেছি মুসলমান আতঙ্কে। ■

টিপু সুলতানের ‘রক্তাক্ত’ তরবারি

বিনয়ভূষণ দাশ

সম্প্রতি ঐতিহাসিক চরিত্র টিপু সুলতানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে কর্ণাটকে রাজ্য জুড়ে অশান্তি ও হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কর্ণাটক রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই জন্ম শতবার্ষিকী পালন ওই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। ওই রাজ্যের কুর্গ অঞ্চলের মাডিকেরীতে জন্ম শতবার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত আন্দোলনকারীদের উপরে কংগ্রেস সরকারের পুলিশের গুলিচালনার ফলে কুট্টাপ্পা নামে এক বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। এর ফলে ওই বিক্ষোভ চিত্রদুর্গ, ম্যাঙ্গালোর, টুমকুর ইত্যাদি অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি এ মাসের ন’ তারিখের (৯.১১.১৫)। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য হলো, টিপু সুলতান অত্যন্ত গোঁড়া ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন। অন্যদিকে ওই রাজ্যের ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো টিপু ছিলেন অসহিষ্ণু, অত্যাচারী এবং বহু চার্চ ধ্বংসকারী। সে শুধু খৃষ্টানদের দলবদ্ধভাবে হত্যা করেই শান্ত থাকেনি, উপরন্তু ম্যাঙ্গালোর এবং কেরল উপকূলের বহু গীর্জা ধ্বংস করেছিলেন। অন্যদিকে, কোডাভা এবং ভোক্কালিগা— এই দুই হিন্দু সম্প্রদায় ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। কারণ টিপু সুলতান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্বিচারে হত্যাই শুধু করেননি, নির্বিচারে ধ্বংস করেছেন হিন্দু মন্দিরও। আর এই ধরনের এক অস্থির সময়ে নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশ কারনাড প্রস্তাব করে বসেন, ব্যাঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম পাল্টে টিপু সুলতানের নামে করা হোক। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে।

কারণ ব্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের নাম ‘ভোক্কালিগা’ সম্প্রদায়ভুক্ত রাজা কেম্পেগৌড়ার নামে। রাজা কেম্পেগৌড়াই ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালুরু শহরের পত্তন করেন। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া তো এমনও বলে বসেন যে, টিপু সুলতান হলেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী। একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে তিনি ইতিহাসকেও বিকৃত করতে পিছপা নন।

টিপু সুলতান ছিলেন এক উগ্র, অসহিষ্ণু, অত্যাচারী শাসক। সমকালীন ভারতবর্ষে এমন উগ্র, ধর্মান্ধ শাসকের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ মেলে। আর তাকে নিয়েই এক উগ্র, অসহিষ্ণু রাজনীতির খেলায় মেতেছেন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া ও গিরিশ কারনাড। তাই টিপু সুলতান সম্পর্কে ইতিহাস কী বলছে তা’ দেখে নেওয়া যাক :

কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক, চার্লস রস, এডওয়ার্ড মুর, কর্নেল উইলসন, মার্ক উইলকস্ প্রমুখ ঐতিহাসিক তাঁদের লেখায় টিপু সুলতানের নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অসহিষ্ণু আচরণের দিকটি তুলে ধরে তার নিন্দা করেছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক টিপুর হিন্দু এবং খৃষ্টানদের জোরজবরদস্তি করে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরণের উল্লেখ করেছেন। হিন্দু মন্দির এবং খৃষ্টানদের গীর্জা ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ্ এইচ্ ডড্ওয়েল (H.H. Dodwell) তাঁর The Cambridge History of India, Volume-V-এ বলেছেন, “He was a man of savage passions and vaulting ambition, whose capacities were not equal to his own estimation of his powers. He ruled, as a convinced Muhammadan over a population of Hindus, whose ancient sovereigns his father had dispossessed and whom he had bitterly persecuted. The district around Mysore abhorred him.”

শাসক হিসেবে টিপু সুলতানকে কর্ণাটকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এতটাই ঘৃণা ও বিদ্বেষের সঙ্গে দেখত। কোনো সহিষ্ণু ও প্রজারঞ্জক শাসকের ক্ষেত্রে যা অকল্পনীয়। অন্য এক ঐতিহাসিক কর্নেল মার্ক উইলক্স্ তাঁর ‘Historical sketches of the south of India’ গ্রন্থে লিখেছেন, “Unlinisted persecution united in detestation of his rule every Hindu in his dominions. In the Hindu no degree of merit was a passport to his favour; is the Musalman no crime could ensure displeasure. Tipu is an age when persecution only Survived in history revived its worst terrors. He was barbarous where severity was vice, and indulgent where it was virtue.

তাঁর প্রজাদের শুভেচ্ছা নয়, তাঁর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব একান্তভাবেই তাঁর উপর নির্ভর করত। টিপু সবাইকেই সন্দেহ করত; সবার প্রতিই ছিল তাঁর নিষ্ঠুরতা। ফলে শ্রীরঙ্গপত্তনমে তার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার সাম্রাজ্যেরও পতন হয়। এতে কেউ দুঃখ পাননি। কারণ, টমাস মুনরো তাঁর চিঠিতে বলেছেন, “also he was so suspicious and cruel that none of his subjects, none probably of his children, lamented his fall.”

আসলে প্রজাপীড়ন, জোর করে ধর্মান্তর করা, মন্দির ও গীর্জা ধ্বংসকরণ ইত্যাদির

মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার পতনের বীজ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তর করে, তাঁদের মন্দিরাদি ধ্বংস করে এক মুসলমান রাজ্য স্থাপনের উদগ্র বাসনাই তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেকে মহীশূরের (Mysore) 'বাদশাহ' হিসেবে ঘোষণা করেন। এইচ্ ডি শর্মা লিখেছেন, টিপু সুলতান আফগানিস্তানের দুররাণী সাম্রাজ্যের মুসলমান শাসক জামান শাহকে লেখা চিঠিতে এই পদবি ব্যবহার করেন এবং লেখেন যে, তিনি ভারতবর্ষে এক ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং এই আদর্শ পূর্তির জন্য তিনি জামান শাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আহ্বান জানান। টিপু সুলতান তাঁর এই আদর্শ পূর্তির জন্য কোদাগু (বর্তমান কুর্গ) আক্রমণ করে সেটি দখল করেন। কুর্গের অধিবাসী 'কোদাভা'দের কাছে ঘোষণা করেন, ''I will honour everyone of you with Islam.''

হাজার হাজার 'কোদাভা' সম্প্রদায়ের মানুষকে বন্দী করা হয়। তাঁদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করা এবং শেষে পুরুষ, মহিলা ও শিশু সহ সবাইকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় জোর করে। বৃটিশ শাসক মার্ক উইলক্স্-এর মতে, এই ধর্মান্তরিত কোদাভা-দের সংখ্যা ৭০ হাজার। আর ঐতিহাসিক লুইস রাইসের মতে সংখ্যাটি ৮৫ হাজার। অন্যত্র, মুসলমান ঐতিহাসিক মির কিরমানি ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ৮০ হাজার বলে মনে করেন। আবার শ্রীরঙ্গপত্তনম দখল করার পরে টিপু সুলতান সেখানকার নায়ার হিন্দুদের, যাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশি, নিষ্ঠুর অত্যাচার করে শেষে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। এদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুও ছিল।

হিন্দুদের জোর জবরদস্তি মুসলমানে ধর্মান্তরিত করার এমন উদগ্র বাসনা আমরা তার (টিপুর) লেখা চিঠিতেও পাই। মালাবার উপকূলের বেকলের (ত্রিবাঙ্কুরের কাছে) শাসক বদরুজ জামান খানকে ১৯.১.১৭৯০-এ লেখা চিঠিতে টিপু লেখেন, ''Don't you know I have achieved a great victory recently in Malabar and over four lakh Hindus where converted to Islam ? I am determined (determined) to march aganinst that cursed Raman Nair (Raja of Travancore) very soon. Since I am overjoyed at the prospect of converting him and his subjects to Islam. I have happily abandoned the idea of going back to Srirangapatnam now.''

কী অপূর্ব ভাষা সহিষ্ণু শাসক টিপু সুলতানের! সহিষ্ণুতার প্রতীক বুদ্ধিজীবীগণ কী বলেন?

এরপরে খৃষ্টানদের উপর টিপু সুলতানের নির্যাতন, তাঁদের ধর্মান্তরকরণ ও গীর্জা ধ্বংস করার কিছু ঘটনা বিবৃত করতে চাই। শ্রীরঙ্গপত্তনমে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের উপরে টিপু অবরোধ শুরু করেন ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে যা' ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ অবধি চলে। এ সম্পর্কে The Barcoor manuscript-এর রিপোর্টে টিপু সুলতানের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে টিপু সুলতান বলেছেন, ''All Musalmans should unite together, and considering the annihilation of infidels as a sacred duty, labour to the utmost of their power to accomplish that subject.''

Tne Barcoor manuscript-এ আরও বলা হয়েছে, 'Soon after the treaty control of Camara. He issued orders to seize (seize) the Christions in Camara, Confiscate their estates and deport them to Seringapatnam, the Capital of his Empire.

টিপু ফতোয়া জারি করলেন ২৭টি গীর্জা ধ্বংস করবার জন্য, যেগুলি নানা খৃষ্টীয় সন্তদের মূর্তি দিয়ে সুন্দরভাবে শোভিত ছিল। এই গীর্জাগুলির মধ্যে ছিল ম্যাঙ্গালোরের 'নোসা সেনহোরা' গীর্জা, মঞ্চে ম্যারিয়ানোর ফাদার মিরান্দার 'সেমিনারি গীর্জা', ওমজুরের 'চার্চ অফ্ জেসু মেরি জোস', বোলারের চ্যাপেল, ইত্যাদি। ম্যাঙ্গালোরের প্রায় ত্রিশ হাজার রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে যুবতী, মহিলা ও কম বয়সের মেয়েদের মুসলমানদের বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

টিপু সুলতানের এই গোড়ামি ও অসহিষ্ণুতা শুধুমাত্র হিন্দু ও খৃষ্টানদের মুসলমান ধর্মে জোর করে ধর্মান্তরকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরন্তু বিভিন্ন স্থানের পুরনো হিন্দু নামগুলিও ইসলামি নামে পরিবর্তন করা হয়েছিল। যেমন মঙ্গলাপুরী (ম্যাঙ্গালোর)-কে পরিবর্তিত করা হয় জালালাবাদে, কান্নানোরকে কুঘ্রানাবাদে, বেপুরকে সুলতানপট্টনমে, মহিশূরকে নজরাবাদে, রত্নাগিরীকে মুস্তাফাবাদে, ডিন্ডিগুলকে খলিফাবাদে এবং কালিকটকে ইসলামাবাদে। যেমন বাংলায় নবাবেরা করেছিলেন, মুক্সুদাবাদকে মুর্শিদাবাদ, ঢাকাকে জাহাঙ্গিরনগর, কলকাতাকে আলিনগর, রাজমহলকে আকবরনগর, বদ্রীহাটকে গিয়াসাবাদ, ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হলো, টিপু সুলতানের মতো এমন একজন অসহিষ্ণু, অত্যাচারী পরধর্মদ্বেষী, ধর্মান্ধ শাসকের জন্মজয়ন্তী এমন সমারোহে পালনের সিদ্ধান্ত কেন নিল কর্ণাটকের কংগ্রেসী সরকার! দাদরির দুর্ভাগ্যজনক এক হত্যাকে কেন্দ্র করে যাঁরা সারাদেশে 'সহিষ্ণুতার' জন্য মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছে তাদের এমন বিপরীত আচরণ কেন? কারণ, Contradiction thy name is Congres! ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

বেদে গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণের নির্দেশ নেই

ড. সীতনাথ গোস্বামী

।। ১।।

গোজাতিকে ঋগ্বেদে অবধ্য বলা হয়েছে

ঋগ্বেদের বহু স্থলে গাভীকে অঘ্ন্যা অর্থাৎ অবধ্যা বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গাভী এই অর্থে 'অঘ্ন্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন— ''প্রশংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীলং

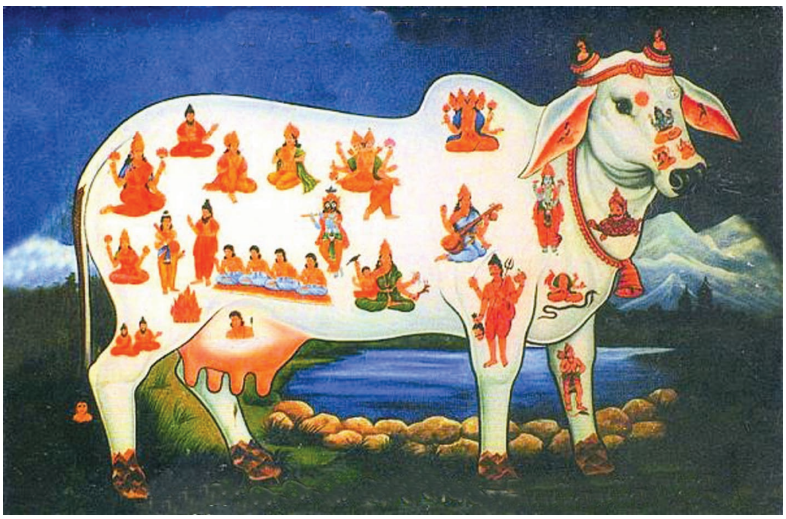

যচ্ছর্ধো মারুতম্। জন্তে রসস্য বাবৃধে।'' (ঋক্ সং ১/৩৭/৫), ''হিঙ্কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাং। দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভাগায়।'' (ঋক্ সং ১/১৬৪/২৭), ''অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীম্'' (ঋক্ সং ৪/১৬৪/৪০), ''শুচি খৃতং ন তপ্তমঘ্ন্যায়াঃ'' (ঋক্ সং ৪/১/৬), সুপ্রপাণং ভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ' (ঋক্ সং ৫/৮৩/৮), ''যাবঘ্ন্যামপিন্বতমপো নস্তর্যম্'' (ঋক্ সং ৭/৬৮/৮) ইত্যাদি।

বেদের অতি প্রাচীন (খৃ. পূ. ৭০০ অব্দ) ব্যাখ্যাতা নিরুক্তকার যাস্ক 'অঘ্ন্যা' শব্দের দুইটি অর্থ বলিয়াছেন— ''অঘ্ন্যা অহন্তব্যা ভবতি, অঘঘ্নীতি বা'' (নিরুক্ত ১১/১৪)। প্রথমটি— যাহা হত্যার অযোগ্য। দ্বিতীয় অর্থ— যাহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্পর্শ করিলে সকল পাপ দূরীভূত হয়।

অথর্ববেদে গো-হত্যা নিষিদ্ধ

অথর্ববেদের বহু স্থলে গাভীকে 'অঘ্ন্যা' বলা হইয়াছে। যেমন ''অঘ্ন্যে পদবীর্ভব'' (অথর্ব সং ১২/১০/১২), ''অঘ্ন্যে প্রশিরো জহি'' (অথর্ব সং ১২/১০/১৪), ''নীচীনমঘ্ন্যা দুহে'' (অথর্ব সং ৬/৯১/২) ইত্যাদি।

অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, বেদে কেবলমাত্র গাভীর অর্থাৎ স্ত্রীজাতির বধ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বৃষের অর্থাৎ পুরুষজাতির বধ অনিষিদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদিগের নিকট বক্তব্য যে, অঘ্ন্যম্, অঘ্ন্যঃ প্রভৃতি পুংলিঙ্গের ব্যবহারও আছে যেমন ''প্রশংসা গোষ্বঘ্ন্যম'' (ঋক্ সং ১/৩৭/৫) ''গবাং যঃ পরিরঘ্ন্যঃ'' (অথর্ব সং ৯/৪/১৭) ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে গোহত্যার স্পষ্ট নিষেধ

কেবল 'অঘ্ন্যা' বা অহন্তব্য এই বিশেষণের দ্বারাই যে বেদে গো-হত্যা নিষিদ্ধ এমন নয় কিন্তু গোহত্যার স্পষ্ট নিষেধও রহিয়াছে, এইরূপ বেদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন— ''মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট'' (ঋক্ সং ৮/১০১/১৫), ''গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্'' (তৈঃ সং ৪/২/১০/২) ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে গোহত্যার উল্লেখ আছে কি না?

এখন আলোচ্য যে, ঋগ্বেদে বা অন্যান্য বেদগুলিতে বা উপনিষদে গোহত্যা চলিতে থাকার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় কি না। প্রথমত, ঋগ্বেদের কথাই আলোচনা করা যাক। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে ১৪টি স্থল উদ্ধৃত করেন যেখানে গোহত্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার 'বেদ প্রকাশিকা' নামক গ্রন্থে 'ঋগ্বেদের সময় গোমাংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা' এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দত্ত মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্রমাণেরই বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেকটি স্থলেই মূলতঃ ব্যাখ্যা কিরূপ হওয়া উচিত ছিল আর দত্ত মহাশয়ই বা কোথায় ভুল করিয়াছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করেন। সেই ১৪টি মন্ত্রেরই পুনরায় এই স্থলে আলোচনা না করিয়া আমি প্রথম কয়েকটি মন্ত্রের আলোচনা করিতেছি এবং বটব্যাল মহাশয়ের সমর্থনে আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি।

দত্ত মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত প্রথম মন্ত্রটি হইতেছে—

ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং
বর্মের স্যুতং পরি পাসি বিশ্বতঃ।
স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যোনকৃজ্
জীবযাজং যজতে সোপমা দিবঃ।।
(ঋক্ সং ১/৩১/১৫)

ইহার অর্থ— হে অগ্নি, যে পুরুষ অর্থাৎ যজমান ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকে তাহাকে তুমি সর্বতোভাবে রক্ষা কর, যেমন নিশ্ছিদ্র বর্ম শরীরকে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি স্বাদু---অন্নযুক্ত, অতিথিগণের সুখকারক, জীবযজন সহিত যজ্ঞ করে অথবা জীবনিষ্পাদ্য যজ্ঞ (জীবযাজম্) করে তাহার নিকট তুমি স্বর্গের ন্যায়ই সুখদায়ক হইয়া

থাক। সায়ণাচার্যের ভাষ্য অনুসারে এইরূপই অর্থ হইয়া থাকে। এখন বিবাদ হইল এই মন্ত্রের অন্তর্গত ''জীবযাজং'' পদটি লইয়া। সায়ণাচার্য ইহার অর্থ করিয়াছেন--- জীবযাজং জীবযজনসহিতং যজ্ঞং 'জীবনিষ্পাদ্যম্।' উইল্‌সন্ এই 'জীবযাজং' পদটি দেখিয়াই তখনকার দিনে গোহত্যা যে প্রচলিত ছিল তাহারই প্রমাণ পাইয়া গেলেন। এই স্থলে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার ঋগ্বেদ সংহিতার ব্যাখ্যায় যে কথা পাদটীকায় বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি— এই ঋকের অন্তর্গত 'জীবযাজং' পদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছে! কোথায় ওই পদে সর্বজীবপালনরূপ ভূতযজ্ঞের বা আত্মজ্ঞানের বিষয় দ্যোতনা করিতেছে; তা না— কোথায় ওই শব্দ হইতে 'পশুবলি', 'গোমাংস ভক্ষণ' প্রভৃতির প্রমাণ আকর্ষণ করিয়া আনা হইয়াছে! এ সম্বন্ধে রমেশবাবুর একটি নোট (টিপ্পনী) উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন— কি বস্তু কি রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে! ''...অতএব সায়ণ উভয় অর্থই করিয়াছেন, পশুবলির সহিত যজ্ঞ অথবা জীবনিষ্পাদ্য যজ্ঞ।'' ...ঋকের 'জীবযাজং' পদ আমরা মনে করি 'জীবদিগের তৃপ্তিসাধন' অর্থই সূচনা করে; 'জীবহনন' অর্থ উহা হইতে আনয়ন করা কষ্টকল্পনা মাত্র। (ঋক্‌সংহিতার অনুবাদ, ১৫৩৪-১৫৩৫ পৃ.)।

দত্ত মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রমাণটি নিম্নরূপ—

অস্মা ইদু প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।
গোর্ন পর্ব বি রদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ।।

(ঋক্ সং ১/৬১/১২)

এই মন্ত্রের 'গোর্ন পর্ব বি রদা' এই অংশ হইতেই অনেকে গো-হত্যার কথা টানিয়া আনেন। এখানে 'ন' শব্দের অর্থ 'ইব' বামত। তাঁহারা অর্থ করেন— যেমন লৌকিক পুরুষ গরুর অবয়ব কাটিয়া থাকেন ইত্যাদি। কিন্তু সায়ণাচার্য এইরূপ অর্থ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন— ''তত্র দৃষ্টান্তঃ গোর্ন। যথা মাংসস্য বিকর্তারো লৌকিকাঃ পুরুষাঃ পশোরবয়বান্ ইতস্ততো বিভজন্তি তদ্বৎ।'' ইহার অর্থ— 'গোর্ন' এই বলিয়া উপমা দেওয়া হইতেছে। উপমাটি এইরূপ— যেমন মাংসকর্তনকারী লৌকিক পুরুষগণ পশুর অবয়বসমূহ ইতস্ততঃ বিভাগ করিতে থাকে সেইরূপ। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সায়ণাচার্য 'গো' শব্দের অর্থে 'পশু' বুঝিয়াছেন। পশুগণের মধ্যে গোরুর এরূপ প্রাধান্য যে পশু বুঝাইতে 'গো' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং সায়ণাচার্য যে অর্থ করিয়াছেন সে অনুসারে গোহত্যার কোনো কথাই উঠে না।

সায়ণভাষ্য অনুযায়ী অর্থ না করিয়াও অন্য একরূপে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাহা দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। গোর্ন অর্থাৎ রশ্মি যেমন অন্ধকার বিদীর্ণ করে অথবা জ্ঞানজ্যোতি যেমন অজ্ঞানকে দূরীভূত করে সেইরূপ হে ভগবন্ তুমি পর্ব সন্ধিস্থল অর্থাৎ শত্রুর আশ্রয় বা শক্তি বা সর্বতোভাবে তিরশ্চাতির্যগ্‌গামিবজ্রের দ্বারা অথবা শুদ্ধসত্ত্বসরল সৎকর্মের দ্বারা বি রদ অর্থাৎ বিদারণ কর বা ছিন্ন কর ইত্যাদি।

দত্ত মহাশয় তৃতীয় প্রমাণ দিয়াছেন—

ত্বং নো অসি ভারতাগ্নে বশাভিরুক্ষভিঃ।
অষ্টাপদীভিরাহুতঃ।। (ঋক্ সং ২/৭/৫)

উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে, 'বশা' শব্দের অর্থে বন্ধ্যা পশু মাত্র বুঝাইয়া থাকে, 'উক্ষা' শব্দের অর্থ 'সেচনসমর্থঃ পুঙ্গবঃ' অর্থাৎ 'রেতঃসেবকসমর্থ পুংপশু'। 'গো' বলিতে যেমন পশু বুঝাইয়া থাকে, তেমনই 'পুঙ্গব' বলিতে পুংপশু বুঝাইয়া থাকে। আর 'অষ্টাপদী'র অর্থ শরভ বা তজ্জাতীয় কোনো পশু।

অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার জন্য উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে গোহত্যার কথা বা গোমাংস ভক্ষণের কথা বলা হইয়াছে বা ঋষিগণ নিজেরাই গোমাংস ভক্ষণ করিতেন এইরূপ কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞতার জন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন। **মন্ত্রের অর্থের দিকে মনোযোগ দিলে ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কুপ্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলে কেহই আর ঋগ্বেদে গোমাংস ভক্ষণের বিধান আছে এইরূপ বলিতে পারিবেন না।**

ঋগ্বেদে ভিন্ন আরও কয়েকটি সন্দিগ্ধ স্থলের ব্যাখ্যা আমি এই স্থলে করিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে, সেই সকল স্থানে গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহার প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

।। ২।।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬/৪/১৮ মন্ত্রটি এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রটি এইরূপ— ''অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্ বেদান্ অনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা।'' আপাত দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ দেখিলে মনে হইবে যে, এখানে গোমাংস ভক্ষণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত তীর্থ মহাশয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে তিনিও এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। যেমন— ''যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র পণ্ডিত, দেশবিখ্যাত, সভাসদ ও শ্রুতিপ্রিয় বচনভাষী হউক; এবং সে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করুক, সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক, (সেই লোক ও তাঁহার পত্নী) মাংসমিশ্রিত অন্ন পাক করিয়া ঘৃতযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে। যৌবনাবস্থ বা ততোধিক বয়স্ক ষাঁড়ের মাংস দ্বারা (মিশ্রিত ওদন ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে, ওইরূপ পুত্র) সমুৎপাদনে সমর্থ হয়।'' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১৫৭০ পৃঃ)। এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য পড়িলেও আপাতদৃষ্টিতে গোমাংস ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হইবে। শঙ্করাচার্য এই অংশের ভাষ্যে লিখিয়াছেন— ''বিবিধং গীতো বিগীতঃ প্রখ্যাত ইত্যর্থঃ...মাংসন-মিশ্রমোদনং মাংসৌদনম্ তন্মাংসনিয়মার্থমাহ —ঔক্ষেণ বা মাংসেন; উক্ষা সেচনসমর্থঃ পুঙ্গবঃ, তদীয়ং মাংসম্ ঋষভস্ততোঽপ্যধিকবয়াঃ, তদীয়মার্ষভং মাংসম্।'' এই শঙ্করভাষ্যের অর্থও দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ বলিয়াছেন—

''...'মাংসৌদন' অর্থ মাংসমিশ্রিত ওদন, যে মাংস গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিয়মিত করিয়া বলিতেছেন যে, ঔক্ষ মাংস; উক্ষা অর্থ রেতঃসেকসমর্থ পুং গো (ষাঁড়); তাহার মাংস (ঔক্ষ); তদপেক্ষাও অধিক বয়স্ক ষাঁড় ঋষভ; তাহার মাংস আর্ষভ।''

এইভাবে মন্ত্র ও ভাষ্যে গোমাংস ভক্ষণের বিধান আছে বলিয়া মনে হইলেও পূর্বাপর সঙ্গতি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই মন্ত্রের ও ভাষ্যের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। উক্ষা (উক্ষণ্), পুঙ্গব, ঋষভ ও মাংস এই চারিটি শব্দের প্রকৃত ও প্রাসঙ্গিক অর্থেই এই বিষয়ের সমাধান হইবে। সাধারণতঃ সকলের মতে অন্যান্য স্থলের ন্যায় এই স্থলের উক্ষা, পুঙ্গব ও ঋষভ শব্দের অর্থ গোরু। সুতরাং ভাষ্যের 'তদীয়ং মাংসম্' বলিলে গোরুর মাংসই বুঝাইবে। কিন্তু উক্ষা, পুঙ্গব ও ঋষভ শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ এখানে 'অষ্টবর্গান্তর্গত একটি বিশেষ ওষধি', যাহার ঔষধ হিসাবে প্রয়োগের বিধান আছে। আর ''মাংস'' শব্দের অর্থ ''শাঁস''। ভাষ্যে আছে উক্ষা সেচনমর্থঃ পুঙ্গবঃ অর্থাৎ রেতঃসেবকসমর্থ ওষধি বিশেষ। উদ্ভিদ্ মাত্রেরই প্রজনন শক্তি আছে, তাদের রেতঃসেকের দ্বারাই যে ফুলফলের সৃষ্টি হয় তাহা বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং 'সেচনসমর্থঃ পুঙ্গবঃ' এই অংশের অর্থ 'রেতঃসেবকসমর্থ ওষধিবিশেষ' বলিলে কোনো ক্ষতি হয় না।

শালিগ্রাম বৈশ্যবর্যের লিখিত 'শালিগ্রামনিঘণ্টুভূষণম্' অর্থাৎ 'বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর' নামক বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে (১৬৪ পৃ.) বলা হইয়াছে যে, ঋষভ, পুঙ্গব, উক্ষা, বৃষভ প্রভৃতি একটি বিশিষ্ট ওষধিরই নাম, তাহা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাহার গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহাতে বলা হইয়াছে—

ঋষভকো মধুঃ শীতো গর্ভসন্ধানকারকঃ।
শুক্রধাতুফানাং চ কারকো বলদায়কঃ।।
বৃষ্যঃ (বীর্যজনক)...ইত্যাদি।

সন্তান উৎপাদনের কামনায় ঋষভ নামক এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ঔষধ সেবন যথোপযুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে ঋষভ ও ঋষভক একই বস্তু। ঋষভের বর্ণনা প্রসঙ্গেই যখন তাহার গুণের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তখন ঋষভ না বলিয়া ঋষভক বলা হইয়াছে। কেবল ছন্দ রক্ষার জন্য অথবা ওই নামেও প্রসিদ্ধি ছিল বলিয়া 'ক' যুক্ত করা হইয়াছে।

কেশব স্বামীর 'নানার্থাকসংক্ষেপ'-এ ঋষভ শব্দের অর্থ 'ঔষধ' বলা আছে— ''ঋষভো বৃষভে... শৃঙ্গিসংজ্ঞে চ ভৈষজ্যে...। হেমচন্দ্রের 'অনেকার্থসংগ্রহে'ও আছে— ''ঋষভঃ...ভেষজে স্বরে।'' (৮৬ পৃ.)। শব্দকল্পদ্রুমে ঋষভ শব্দের অর্থে আছে— ''অষ্টবর্গান্তর্গতৌষ-বিশেষঃ। তৎপর্যায়— 'বৃষঃ, ঋষভকঃ...গৌঃ...লাঙ্গলী...।'' সেখানে ঋষভের আকার সম্বন্ধেও বলা আছে ''ঋষভো বৃষশঙ্গবৎ।'' হয়ত এই জন্যই ওই ওষধির নাম ঋষভ বা গোবাচক শব্দসমূহ। বাচস্পত্য অভিধানে ঋষভ শব্দের প্রথম অর্থই দেওয়া আছে— ওষধি। এম উইলিয়ামস্ তাঁহার অভিধানে 'ঋষভ One of the eight principal medicaments.'

পুঙ্গব শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন— ''পুঙ্গবো গবি ভৈষজ্যে...।'' (১০৬ পৃ.)। শব্দকল্পদ্রুমে আছে— ''ঔষধভেদঃ, ঋষভৌষধম্।'' বাচস্পত্যে আছে— ''পুঙ্গব ঋষভৌষধৌ।'' এম উইলিয়ামস্ লিখিয়াছেন— 'a kind of drug'।

গোপাষ্টমীতে গোমাতার পূজা।

শব্দকল্পদ্রুমে উক্ষন শব্দের অর্থে আছে— 'ঋষভৌষধৌ'। বাচস্পত্যেও আছে— 'উক্ষন্ ঋষভৌষধৌষ', এম উইলিয়ামসও লিখিয়াছেন— 'One of the eight chief chief medicaments (Rishabha)'।

মাংস শব্দের অর্থে ম্যাকডোনেল-এর অভিধানে আছে— 'flesh, meat (Also of fish, crabs and fruit)'। আপ্টের অভিধানে আছে— 'The flashy part of a fruit'। এম উইলিয়ামস্-এর অভিধানে আছে— '...the flesh, of fish, the fleshy part or pulp of fruit'।

এই শব্দগুলির অর্থের প্রামাণ্য দেখাইবার জন্য যে কয়েকখানি প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল। আশা করি, পূর্বোক্ত মত প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে তাহা যথেষ্ট।

ঋষভের অর্থ বলার সময় শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন— 'ঋষভস্ততো-ঽপ্যধিকবয়াঃ' অর্থাৎ ঋষভ পুঙ্গব হইতে অধিক বয়সের। একটু বেশিদিনের পুরাতন পুঙ্গবের নামই ঋষভ। সুতরাং অসামঞ্জস্যের কোনো কারণই ঘটে না।

মন্ত্র বা ভাষ্যের আক্ষরিক অর্থ ব্যাখ্যার পর আরও দুইটি কথা বলার আবশ্যকতা আছে। প্রথমতঃ একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে যে,

'গোরু বা ষাঁড়' অর্থ করিলেও হয় আবার 'ঔষুধ' অর্থ করিলেও যখন হয়, তখন কোন্ অর্থটি গ্রহণীয় আর কোন্‌টিই বা পরিত্যাজ্য? তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, যে ক্রমে (Order) ভক্ষ্যের বিধান করা হইয়াছে সেই ক্রম অনুযায়ী মাংস ভক্ষণের বিধান বিশেষ অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ এই মন্ত্রটির (৬/৪/১৮) পূর্বে ৬/৪/১৪ সংখ্যক মন্ত্রে আছে যে, এক বেদজ্ঞ পুত্র লাভের জন্য ঘৃতের সঙ্গে মিশাইয়া দুধ ভাত খাইতে হইবে, ৬/৪/১৫ সংখ্যক মন্ত্রে আছে যে, দ্বিবেদজ্ঞ পুত্রলাভের জন্য ঘৃতের সঙ্গে মিশাইয়া দধিভাত খাইতে হইবে, ৬৫৪/১৬ সংখ্যক মন্ত্রে আছে ত্রিবেদজ্ঞ পুত্রলাভের জন্য ঘৃতের সঙ্গে মিশাইয়া শুধু ভাত খাইতে হইবে, ৬/৪/১৭ সংখ্যক মন্ত্রে আছে বিদুষী কন্যা লাভের জন্য ঘৃতের সঙ্গে মিশাইয়া তিলভাত খাইতে হইবে। আর হঠাৎ দেখা যাইতেছে যে, চতুর্বেদজ্ঞ পুত্র লাভের জন্য ঘৃতের সঙ্গে মিশাইয়া গোমাংস ভাত খাইবে। দুধভাত, দইভাত, শুধু ভাত, তিলভাতের পর হঠাৎ গোমাংস ভাত খাওয়ার কথাটি বিশেষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া পড়ে না কি? কিন্তু উক্ষা বা ঋষভের অর্থ 'ওষধি' বলিলে এবং তাহার মাংস অর্থে 'শাঁস' বুঝিলে এইরূপ অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় না।

দ্বিতীয়ত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আত্মতত্ত্বের শিক্ষা দেয়। তাহার দ্বারা আত্মজ্ঞান লব্ধ হওয়ার পর সুপুত্র উৎপাদনের জন্য নিষ্ঠুর পশুহত্যার কথা অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়া পড়ে।

গোমেধ যজ্ঞে কি গোবধ হইত?

প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল ইহা দেখাইবার জন্য কেহ কেহ 'গোমেধ' যজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে যেমন অশ্বকে বধ করা হয়, সেইরূপ গোমেধ যজ্ঞের গোরুকে বধ করা হয় এইরূপই তাঁহাদের বক্তব্য।

অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে বধ করা হয় বলিয়া 'গোমেধ' যজ্ঞে গোবধ হইত, কারণ 'মেধ' (মেধৃ) ধাতুর অর্থ হিংসা করা— এইরূপই যদি যুক্তি হয় তাহা হইলে পিতৃমেধ বা গৃহমেধের অর্থ কি হইবে? ইহার দ্বারা পিতৃহত্যা বুঝাইবে? না, গৃহহত্যা বুঝাইবে? বস্তুতঃ পিতৃমেধ বলিতে বুঝায় পিতাকে বা পিতৃগণকে সৎকার্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করা। গৃহমেধের অর্থ পরিবারের সকলের আরোগ্য। এইরূপ নরমেধের অর্থ নরহত্যা নয়, অতিথি পূজাই বাস্তবিক নরমেধ। এই সম্পর্কে মনু বলিয়াছেন— প্রত্যহ গৃহস্থকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হয়, যেমন— ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। ইহাদের স্বরূপ বলিতে গিয়া মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।।

(মনুসংহিতা ৩/৭০)

অর্থাৎ অধ্যাপনই ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণই পিতৃমেধ, হোমই দৈবযজ্ঞ, কৃমিকীট সমূহের জন্য অন্ন সমর্পণ করাই ভূতযজ্ঞ আর অতিথি পূজাই নরমেধ। এইরূপ গোমেধের অর্থ গোজাতিকে তুষ্ট করা, নতুবা গোমেধের দ্বারা যদি গোরুকে হত্যা করিয়া যজ্ঞ করা বুঝাইত তাহা হইলে বেদের মধ্যেই পরস্পরবিরোধের দোষ আসিত। একদিকে ঋগ্বেদেই গোহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে, গোরুকে অঘ্ন্য বলা হইয়াছে। অপরদিকে গোরু হত্যা করিয়া যজ্ঞ করা— এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং গোহত্যানিষেধক শ্রুতির সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য তাহার সহিত অবিরোধেই গোমেধ শব্দটির অর্থ করিতে হইবে।

।। ৩।।

'গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্' (ঋক্ সং ৯/৪৬/৪)— এই মন্ত্রের অর্থ অনেকে মনে করেন— গোমাংসের সহিত সোম পাক করা। বস্তুতঃ এই মন্ত্রের অর্থ অন্য প্রকার। গো শব্দের অর্থ এই স্থলে দুধ। গোজাত দ্রব্য 'দুধ' এই অর্থে গো শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'গোজাত' এই অর্থ বুঝাইবার জন্য এস্থলে তদ্ধিত প্রত্যয় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সেই তদ্ধিতপ্রত্যয় এই স্থলে নাই। এই মন্ত্রের অর্থ কথন প্রসঙ্গে যাস্কাচার্য নিরুক্তে বলিয়াছেন— ''অথাপ্যস্যং তাদ্ধিতেন কৃৎস্নবন্নিগমা ভবন্তি 'গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরমিতি পয়সঃ।" (নিরুক্ত ২/৫)

এই স্থলে গো শব্দের অর্থ যে দুধ তাহা ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের দ্বিতীয় সূত্র 'সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ'-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন। ''প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ— যথা গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্"। ইহার অর্থ—বিকার অর্থেও প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার হয় যেমন 'গোভিঃ' শ্রীণীত মৎসরম এই স্থলে। যাহা হইতে অন্য দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহাকে সেই দ্রব্যটির প্রকৃতি বলা হয় এবং যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে বিকৃতি বা বিকার বলে। গাভী হইতে দুধ উৎপন্ন হয় বলিয়া গাভী প্রকৃতি এবং দুধ বিকৃতি।

মধুপর্কে গোমাংস থাকিত না

মধুপর্কে গোমাংস দেওয়া হইত এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। এখন ইহাই আলোচনা করিতে হইবে যে, বস্তুত মধুপর্ক বলিতে কি বুঝায় এবং কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা মধুপর্ক রচিত হয়। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, মধুপর্ক শব্দটি সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে কেবলমাত্র অথর্ববেদেই পাওয়া যায় এবং তাহাও মাত্র একবার। যেস্থলে মধুপর্ক শব্দটি পাওয়া যায় সেই মন্ত্রটি হইল—

''যথা যশঃ সোমপীথে মধুপর্কে যথা যশঃ।"

(অথর্ব সং ১০/৩/২১)

ইহার অর্থ— সোমপানে এবং মধুপর্কে যে যশ, আমিও যেন তাহা প্রাপ্ত হই। এই মন্ত্র হইতে গোমাংসের দ্বারা মধুপর্ক রচনার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঠিক মধুপর্ক শব্দটি না থাকিলেও অন্য আর এক স্থলে 'মধুপেয়' শব্দ পাওয়া যায়। সেই মন্ত্রটি নিম্নরূপ—

বৃষাঽসি দিবো বৃষভঃ পৃথিব্যা বৃষা সিন্ধুনাং বৃষভস্তিয়ানাম্।
বৃষ্ণে ত ইন্দুর্বৃষভ পীপায় স্বাদু রসো মধুপেয়ো বরায়।।

(ঋক্ সং ৬/৪৪/২১)

এই মন্ত্রটিতে 'বৃষা' ও 'বৃষভ' শব্দ দেখিয়া অনেকে মধুপেয় বা মধুপর্কের মধ্যে গোমাংসের অস্তিত্ব অনুমান করেন। বস্তুতঃ এই মন্ত্রের অন্তর্গত বৃষা ও বৃষভ শব্দের অর্থ অন্যপ্রকার। সায়ণাচার্য

তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন— ''হে ইন্দ্র, ত্বং দিবো দুলোকস্য বৃষাষি হবির্ভিঃ সেক্তা ভবসি, পৃথিব্যা ভূমৈশ্চ বৃষভঃ কামনাং বর্ষিতা...বৃষা বর্ষেণ পুরয়িতা...বৃষভ কামানাং বর্ষিতা...।'' সায়ণাচার্য বৃষা বা বৃষভ শব্দের কোনো স্থলেই ষাঁড় এইরূপ অর্থ করেন নাই। সুতরাং মধুপর্কে গোমাংস দেওয়ার কথা বেদ হইতে প্রমাণিত হয় না।

প্রাচীনকালে অতিথি, ব্রাহ্মণ, রাজা প্রভৃতি গৃহে আসিলে মধুপর্ক দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মনুসংহিতায় আছে—

রাজত্বিক্ স্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান্।
অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ।।
রাজা চ শ্রোত্রিয়শ্চৈব যজ্ঞকর্মণ্যুপস্থিতে।
মধুপর্কেণ সংপূজ্যৌ ন ত্বযজ্ঞ ইতি স্থিতিঃ।।

(মনু ৩/১২০)

এই মধুপর্কের উপাদান কি কি— এই লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। ''দধি সর্পিঃ পয়ঃ ক্ষৌদ্রং সিতা চৈতৈশ্চ পঞ্চভিঃ প্রেচ্যতে মধুপর্কঃ'' ইহা একটি মত। অর্থাৎ দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু ও মিছিরি— এই পাঁচটি লইয়া মধুপর্ক হইয়া থাকে। কাত্যায়ন স্মৃতিতে মধুপর্কের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

সাক্ষতং সুমনোযুক্তমুদকং দধিসংযুতম্।
অর্ঘ্যং দধিমধুভ্যাঞ্চ মধুপর্কো বিধীযতে।।

(কাত্যায়নস্মৃতি ২৯/১৮)

অর্থাৎ আতপ চাল, ফুল, জল, দধি ও মধু এই কথাটির দ্বারা মধুপর্ক রচনার কথা বলা হইয়াছে। বৃহৎপরাশর স্মৃতিতে বলা হইয়াছে— 'মধুমাংসাজ্যাপায়সৈঃ' (বৃহৎপরাশর, ৬/৮০)। ইহাতে মধু, মাংস, ঘৃত ও দুগ্ধের দ্বারা মধুপর্কের রচনার কথা বলা আছে।

অতিথিকে মধুপর্ক দেওয়ার কথা সুপ্রচলিত। অতিথিপূজাই মনুষ্যযজ্ঞ। এই জন্য অতিথিকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিয়া তাহাকে সুন্দর ও সুমিষ্ট ভোজনের দ্বারা পরিতৃপ্ত করার কথা সকল ধর্মশাস্ত্রকারই বলিয়াছেন। এমনকী অতিথি ভোজন করিয়া আসিলেও তাহাকে পুনরায় ভোজন করাইবার কথা বলা হইয়াছে। অতিথিকে গোদানের কথা ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কাহারো মতে অতিথিকে যে মধুপর্ক দেওয়া হইত তাহাতে গোমাংস থাকিত। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, অতিথি প্রতিদিনই গৃহে আসিবে এবং অতিথিকে না দিয়া অন্ন ভক্ষণ করা নিন্দনীয় ছিল। এখন সেই অতিথিকে যদি প্রত্যহ গোমাংস দ্বারা মধুপর্ক বিধান থাকিত তাহা হইলে কী পরিমাণ গোরুর আবশ্যক হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। আর এইরূপ অধিক সংখ্যায় গোরু গৃহে রাখা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব। অথচ এই অতিথিপূজা প্রতি গৃহস্থের আচরণীয় ধর্ম। আরও কথা, এক দিকে গোহত্যার তীব্র নিন্দা করা হইবে অপরদিকে প্রতিদিন গোহত্যা চলিতে থাকিবে— এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে করা যাইবে? যেখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোহত্যা করিয়া ফেলিলে দুঃসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, যেখানে গোরুকে একটু শক্ত দণ্ডের দ্বারা আঘাত করিলেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সেইখানেই আবার প্রতিদিন গোহত্যার বিধান! মধুপর্ক দেওয়া অতিথিকে সমৃদ্ধ ভোজন করান ইত্যাদির অর্থ অতিথির পরিতুষ্টি বিধান। যখন বলা হইয়াছে যে, তৃণ, ভূমি, জল, সত্য ও প্রিয় বাক্য দ্বারাই অতিথিকে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অতিথির সন্তুষ্টি বিধানই প্রধান লক্ষ্য। মনুসংহিতায় আছে—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তেকদাচন।।

(মনু ৩/১০১)

।। ৪।।

গোহত্যা বিহিত হয় নাই—অর্থবাদ মাত্র

আপাতদৃষ্টিতে যে সকল স্থলে গোহত্যার বিধান আছে বলিয়া মনে হয় বস্তুতঃ তাহার তাৎপর্য কিন্তু অন্য প্রকার। বেদের বহুস্থলে অর্থবাদ আছে তাহা আমরা জানি। অর্থবাদ বাক্যের উদ্দেশ্য স্তুতি করা। সেই স্তুতিতেই সেই বাক্যের তাৎপর্য থাকে না। যেমন— স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ, তামগ্নৌ প্রাহরৎ, তস্মাতুপরঃ পশুরুদপদ্যত। ইহার অর্থ, প্রজাপতি নিজের চর্বি ছিন্ন করিলেন, তাহা অগ্নিতে আহুতি দিলেন, তাহা হইতে শৃঙ্গরহিত পশু জন্মগ্রহণ করিল। এই স্থলে তূপর নামক শৃঙ্গরহিত পশুর জন্ম যে উত্তম তাহা বুঝাইবার জন্য প্রজাপতি নিজ চর্বি অগ্নিতে দিয়াছেন এইরূপ বলা হইয়াছে। ওই বাক্যগুলির আক্ষরিক অর্থে কোনোই তাৎপর্য নাই। সেইরূপ যেসকল স্থলে অতিথিকে গোমাংস দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝতে হইবে--- গোজাতির ন্যায় মহাপূজিত জীবের মাংস দেওয়ার কথা বলায় বস্তুত অতিথি যে মহাপূজ্য তাহাই সূচিত

ঋগ্বেদে গোহত্যার কথা বা গোমাংস ভক্ষণের কথা বলা হইয়াছে বা ঋষিগণ নিজেরাই গোমাংস ভক্ষণ করিতেন এইরূপ কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞতার জন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন। মন্ত্রের অর্থের দিকে মনোযোগ দিলে ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কুপ্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলে কেহই আর ঋগ্বেদে গোমাংস ভক্ষণের বিধান আছে এইরূপ বলিতে পারিবেন না।

হইতেছে। বেদের শতাধিক স্থলে বৃষকে অঘ্ন্য ও গাভীকে অঘ্ন্যা বলার পর, গোজাতির উপর অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পর প্রতিদিন গোমাংস দ্বারা মধুপর্কের আয়োজন করার কি কোনো সামঞ্জস্য থাকিতে পারে? এইজন্যই যখন বসিষ্ঠ স্মৃতি দেখা যায়— ''অথাপি ব্রাহ্মণায় বা রাজন্যায় বাহভ্যাগতায় বা মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবম- স্যাহতিথ্যাং কুর্বন্তি'' (বসিষ্ঠস্মৃতি, ৪/৮) তখন অর্থবাদ হিসাবেই ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় যে আছে—

মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।
সৎক্রিয়াহন্বাসনং স্বাদু ভোজনং সূনৃতং বচঃ।।

(যাজ্ঞবল্ক্য, ১/১০৯)

তাহাতে 'উপকল্পয়েৎ' শব্দের দ্বারা গোহত্যার অর্থ বুঝিবার কোনো কারণই নেই, কেবলমাত্র দান করিলেই চলিবে। প্রত্যেক শ্রোত্রিয়কে গোদান করাও সম্ভবপর নয়, কারণ তাহার জন্য বহু সংখ্যক গোরুর প্রয়োজন। এই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক বলিয়াছেন যে, উক্ষা হত্যাও করিতে হইবে না, দানও করিতে হইবে না, কেবলমাত্র অতিথিকে গোরু দেখাইতে হইবে এবং বলিতে হইবে— ইহা আপনার। বস্তুতঃ দান করিলেই 'ইহা আপনার' এরূপ বলা চলে অন্যথা নহে— ইহা ঠিক নয়। অতিথি গৃহে আসিলে গৃহ দান না করিয়াও গৃহস্বামী বলিয়া থাকেন— আপনারই গৃহ। সেইরূপ গোদান না করিয়া কেবলমাত্র গোরুকে দেখাইয়া বলিতে পারেন— ইহা আপনার। এই স্থলে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বচন (১/১৫৬) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহা লোকসমাজে নিন্দিত তাহা ধর্মসম্মত হইলেও আচরণ করিতে নাই, তাহাতে স্বর্গলাভও হয় না। মিতাক্ষরাতে আছে— ''শ্রোতিয়ায় উক্তলক্ষণায় উপকল্পয়েৎ। ভবদর্থ ময়মস্মাভিঃ পরিকল্পিত ইতি তৎপ্রীত্যর্থং ন তু দানায় ব্যাপাদনায় বা। যথা সর্বমেতদ্ ভবদীয়মিতি। প্রতিশ্রোত্রিয়মুক্ষাহসম্ভবাৎ 'অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্যমপ্যাচরেন্ন তু ইতি নিষেধাচ্চ।'' (৩৪ পৃ.)

ইহা ভিন্ন যদি গোমাংসের কথাই অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে 'মহোক্ষং' বা মহাজং বা' এইরূপ বলার ঠিক পরেই স্বাদু ভোজনের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল, নতুবা প্রথমে ভোজনের কথা বলিয়া তারপর সৎক্রিয়া, আসন ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া আবার সেই ভোজনের কথা বলা সঙ্গত হয় না এই বচনের দ্বারা যে গোহত্যার কথা আসে না তাহা দেখাইবার জন্য দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ঋক সংহিতার ১/১৬ সূক্তের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে এই বচনের একটি ব্যাখ্যা দেখাইয়াছেন। তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি— ''এই স্মৃতিবচনের ভাব এই যে, শ্রোত্রিয়ায় (সর্ববেদাধ্যায়ী সুপণ্ডিত সাধু অতিথিকে) মহোক্ষং (পাপবিধৌতকারী অভীষ্টপূরক পরমধনপ্রদাতা) অথবা মহাজং (মহাত্মা মুক্তপুরুষ) জ্ঞানে সংবর্ধনা করিবে, এবং উপযুক্ত আসন ও স্বাদু ভোজ্যাদি দানে এবং প্রিয়সত্য বাক্যে পরিতুষ্ট করিবে।''

(ঋক্ সংহিতার অনুবাদ, ৩০২০ পৃ.)

এইভাবে দেখান যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে গোহত্যা চলিত না এবং যে কয়েকটি স্থল দেখিয়া মনে হয় যে, গোহত্যা প্রচলিত ছিল তাহাও বস্তুতঃ গোহত্যার প্রতিপাদক নয়। প্রাসঙ্গিক সুসমঞ্জস্য অর্থ করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ স্থলে গোহত্যার কথা বলা হয় নাই।

মহাভারতে গোহত্যা নিষিদ্ধ

মহাভারতের শান্তিপর্বে গোহত্যার তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে—

অঘ্ন্যা ইতি গবাং নাম ক এতা হন্তুমহতি।
মহচ্চকারাকুশলং বৃষং গাং বাহলভেত্তু যঃ।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৬৩ অধ্যায়)

ইহার অর্থ— গোরুর নাম অঘ্ন্য, ইহাদিগকে কে হত্যা করিতে পারে? যে বৃষ অথবা গাভী হত্যা করে সে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে।

স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে গোজাতির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাপ্রদর্শন

স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে গোজাতির প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা দেখান হইয়াছে তাহা সত্যই অতুলনীয়। বৃহৎপরাশর স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—

স্পৃষ্টাশ্চ গাবঃ শশময়ন্তি পাপং
সংসেবিতাশ্চোপয়নয়ন্তি বিত্তম্।
তা এব দত্তাস্ত্রিদিবং নয়ন্তি
গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ।। (১/১০)

ইহার অর্থ— গোরুকে স্পর্শ করিয়া পাপ দূর হয়, গোরুর সেবা করিলে বিত্তলাভ হয়, গোদান করিলে স্বর্গলাভ হয়। গোরুর তুল্য আর কোনো ধন নাই।

গোরুর শরীরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবতা বিদ্যমান আছেন। ইহাতে এইরূপ বলা হইয়াছে—

যস্যাঃ শিরসি ব্রহ্মাহস্তে স্বন্ধদেশে শিবঃ স্থিতঃ।
পৃষ্ঠে নারায়ণস্তস্থৌ শ্রুতয়শ্চরণেষু চ।।
যা অন্যা দেবতাঃ কাশ্চিত্তস্যা লোমসু তা স্থিতাঃ।
সর্বদেবময়া গাবস্তস্যৈত্তদ্ভক্তিতো হরিঃ।।

(বৃহৎপরাশরস্মৃতি ৪/১১-১২)

অর্থাৎ 'গোরুর মস্তকে ব্রহ্মা অবস্থান করেন, স্কন্ধদেশে শিব বাস করেন, পৃষ্ঠে নারায়ণ এবং বেদসমূহ চরণে অবস্থিত আছেন। গাভীর লোমে অনান্য দেবতারা অবস্থান করেন। গোরু সর্বদেবময় এবং গোরুর প্রতি ভক্তি করিলে হরি তুষ্ট হন।' এইরূপে গোমহিমা-বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক স্মৃতিতেই গোরু যে আমাদের অত্যন্ত পূজ্য তাহা বলা হইয়াছে। গোহত্যা নিষিদ্ধ তো ছিলই, এমনকী যদি কেহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোরু মারিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার জন্য ছিল দুঃসাধ্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

(লেখক সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

গো-মাংস ভক্ষণ রাজনীতির নোংরা খেলা

'গো-মাংস ভক্ষণ এবং পুরস্কার ফেরত দেওয়ার নাটক আদতে রাজনীতির নোংরা খেলা' (৯ নভেম্বর স্বস্তিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন) প্রসঙ্গে আমার কিছু কথা।

গো-মাংস নিয়ে দেশজুড়ে যে বিতর্ক চলছে তাতে শত্রুদের নাটক বা রাজনীতির নোংরা খেলা বলে যতই আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা হোক না কেন শত্রু-দল বা সংগঠন কিন্তু সংখ্যায় প্রচুর, অপরদিকে হিন্দুদের পক্ষে সংগঠন কিন্তু নগণ্য। ছোটো ছোটো বা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে বিজেপি, আর এস এস বা ভি এইচ পি-র কোনো উপকার হবে না, হতে পারে না এবং হচ্ছেও না তা বোঝার মতো বিচক্ষণতা না থাকলে তাদের ভারতের মতো 'আত্মঘাতী' দেশে কঠিন রাজনীতির মধ্যে না থাকাই উচিত। সাম্প্রতিক বিহার নির্বাচনের ফলাফলে নীতীশের মহাজোটের বড় জয় তার প্রমাণ। গুটিকতক ছোটো দল-সহ বিজেপি একদিকে আর সমস্ত দল বিপরীত দিকে। লড়াই কৌশলগত ও যুক্তিসংগত হওয়া উচিত। বিরোধী দলগুলি যেমন ব্যাপকভাবে ঝাঁপিয়ে প্রচার করছে, যুক্তিসঙ্গতভাবে ভারতের মঙ্গলদায়ক প্রচার করলে বিজেপি জোটও নিশ্চয় লাভবান হতে পারতো। দুর্নীতির সঙ্গে আপস করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হাওয়াটাই বিলীন হয়ে গেছে। হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা নেতাকেই জনতা আবার বিহারে পছন্দ করলো, কেন তা ভেবে দেখা উচিত। গোমাংস বিতর্কে ফায়দা তুলছে মুসলমানপ্রেমী কংগ্রেস ও অন্যান্য সব দলগুলি। তাহলে এইরকম স্ববিরোধী রাজনীতি করে কাল যদি বিজেপি ক্ষমতায় ফিরতে না পারে, লাভ কী? তবে সব চাইতে বেশি লাভবান হচ্ছে মুসলমানরা যাদের একমাত্র লক্ষ্য দার-উল-হার্ব 'হিন্দুস্তান'কে দার-উল-ইসলাম 'আল্লার স্থানে' পরিণত করা। ওরা ভাবছে হিন্দুরা এই ধরনের আন্দোলন করলে ভালোই হয়, ওদের (মুসলমানদের) লক্ষ্যে পৌঁছাতে সুবিধা হয়। চোখ-কান খোলা রেখে দেখা উচিত আই এস, বোকে হারেম কীভাবে জাল বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। মনে রাখা উচিত বিজেপি হিন্দু-হিতৈষী দল ক্ষমতায় না থাকলে ছোটো, মাঝারি বড় কোনো আন্দোলনই টিকবে না, হিন্দুদের নিজস্ব স্থানই থাকবে না। মুসলমান জনবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি তার অশনিসঙ্কেত বহন করছে।

আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ সংগঠিত করার জন্য 'এক জনসংখ্যা নীতি' (মোহন ভাগবতের কথায়)। প্রণয়ণের দাবি করা, পার্সোনাল ল'-এর উচ্ছেদ করা, জনগণের করের টাকায় হজে যাওয়ার ভরতুকি দেওয়া বন্ধ করা, বিভিন্ন জায়গায় দেবদেবীর মূর্তি ভাঙার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতি করা উচিত। সর্বশেষ আদমসুমারী অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুর জেলাটি হিন্দু মেজোরিটি হারিয়ে মুসলমান মেজোরিটি হয়ে গেল (স্বস্তিকা ৯ নভেম্বর ১৩ পৃ.)। আরো কয়েকটি জেলা মুসলমান মেজোরিটি হতে চলেছে। অসম-এর অবস্থা আরো ভয়াবহ। এই তথ্য দেশের কজন হিন্দু জনগণের কাছে পৌঁছেছে? এর পরিণাম কী হতে যাচ্ছে এ বিষয়ে জনসচেতনতার কোনো কর্মসূচি নেই কেন? বিহার নির্বাচনের ফল থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময় এখনো আছে। শিক্ষা নেবার মতো সুমতি না এলে বিপর্যয় অনিবার্য।

—টিমিড পেনস্পিকার,
বর্ধমান।

।।২।।

হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার রাজপথে গো-মাংস ভক্ষণ করে যে উদারতা দেখালেন— সেটাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলা যায় না বরং বলা যায় নিজ ধর্মকে ঘৃণা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির ক্ষীণতা দেখে বুদ্ধিজীবী ভাবতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

দিল্লীর কেরল ভবনে মেনু লিস্টে গো-মাংসের উল্লেখ আছে— সেটা আমরা সংবাদে দেখেছি। কেরল ভবন একটি সরকারি সংস্থা— সেখানে স্পর্শকাতর কোনো খাবারই রাখা উচিত নয়। যেমন গো-মাংস, শুকরের মাংস, ভেড়ার মাংস ইত্যাদি।

কেরল ভবন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে যে অভিযোগকারী তাকে পুলিশ গ্রেপ্তারি করে কর্তব্য পালন করেছে। এরপর এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেভাবে উঠে পরে লাগলেন তাতে তো মনে হচ্ছে গো-মাংস যেন হিন্দুদেরই সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

খবরে প্রকাশ, বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, কবি সুবোধ সরকার, রাজনীতিবিদ আবদুর রেজ্জাক মোল্লা প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে গো-মাংস ভক্ষণ করে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার উদাহরণ অপূর্ণই থেকে গেল। গো-মাংসের সঙ্গে শুকরের মাংস রাখা অত্যন্ত জরুরি ছিল। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে একসঙ্গে গো-মাংস ও শুকর মাংস গ্রহণ করে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে ষোলকলা পূর্ণ হোত। বাস্তবে তা হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। সংখ্যালঘুদের মনজয় করাটাই বুদ্ধিজীবী হিন্দুদের গো-মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্য।

হিন্দুদের প্রকাশ্যে গো-মাংস খাওয়াটা কখনই উদারতার মধ্যে পড়ে না। এর মধ্যে আছে গভীর এক অভিসন্ধি, আর আছে অ-কৃতীর প্রচারের আলোয় আসার এক অদম্য অভিপ্রায়।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো কোনো ধর্ম, বর্ণ বা কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত না থাকা। দেশের আইন হবে সবার জন্য সমান। এমনকী বিবাহের আইন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের আইন এসবের মধ্যেও সম্প্রদায়গত কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। সংরক্ষণ হবে দারিদ্র্যের নিরিখে, ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় ভেদে নয়।

আজ বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের মতো অ-বুদ্ধিজীবীদের একটাই আবেদন--- একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট হয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি কপচাবেন না তাতে অবুদ্ধিজীবীদের মনে কষ্ট হয়।

—অশোক কুমার ঠাকুর,
কামেশ্বরী রোড (পূর্ব) কোচবিহার।

ইসলামের তাঁবেদারি

সম্প্রতি দৈনিকে প্রকাশিত এক ছবিতে দেখলাম সিপিএমের বিকাশ ভট্টাচার্য কবি সুবোধ সরকারকে গো-মাংস খাওয়াচ্ছেন। দেখে একটুও অবাক হইনি। কারণ স্বধর্মীদের ঘেরাটোপে থেকে স্বধর্মের বিরুদ্ধাচরণ যে এদের মজ্জাগত হয়ে গেছে তার প্রমাণ এরা আগেও ভুরিভুরি রেখেছে। কিন্তু বিধর্মীদের শিবিরে গিয়ে তাদের কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে পারেনি। সেখানে তারা ক্লীব—জড় পদার্থ। কোনো বিধর্মী যদি নগ্ন সরস্বতীর ছবি এঁকে বিতর্কিত হন তবে এরা তাদের সমালোচনায় মিটিং-মিছিলের ঝড় বইয়ে দিতে পারে কিন্তু 'তসলিমা' নাম্নী কোনো লেখিকা যদি স্বধর্মে ত্রুটির বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হন, তার ওপর মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া ঝোলে তাহলে তারা শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে সোচ্চার হতে পারেন না। এদের গণনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে একটাই ধর্ম ঘুরে ফিরে আসে। তা হলো ইসলাম। খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য কোনো সম্প্রদায় নয়। আর তাদের তোষণের নামই উন্নয়ন। জঙ্গিরা যদি কেউ সেই ধর্মাবলম্বী হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা মানেই সংখ্যালঘু নির্যাতন। আর তথাকথিত সংখ্যালঘুরা তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সংগঠিত হলেই তারা তাদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। নিজেদের উপস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে। চীন কিংবা পাকিস্তান আমাদের দেশে থাবা বসালে এরা আলোর উৎসমুখ আমেরিকার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে প্রকৃত তথ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন করার চেষ্টা করে। স্লোগানে চীনের নেতাকে অনুসরণ করার উপদেশ দেয়। এরা পরদেশ, পরধর্মের আদর্শ মেনে চললেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু করে স্বদেশে থেকে আর স্বধর্মের অবলম্বন রেখেই করে। বিদেশে থেকে কিংবা পরধর্ম গ্রহণ করে নয়। দেশে কোটি কোটি লোক গো-মাংস খায়। সে মাংসের দোকানও অগণিত। তবে সেগুলো বিধর্মী প্রভাবিত অঞ্চলে। তারা সেই ধর্ম সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কমিউনিস্টরা সে অঞ্চলে গিয়ে অনায়াসে পেট ভরে গো-মাংস খেতে পারেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে যতই ফলাও করে ছবি ছাপুক, হিন্দুপাড়ায় গো-মাংসের প্রচলন উক্তধর্মীরা কখনোই মেনে নেবেন না। এ জিনিস আইন করে যেমন ঠেকানো সম্ভব নয়। গো-মাংসকে সামনে রেখে মহম্মদ আখলাককে হত্যা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা তদন্তের মাধ্যমে তার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন না করে শুধু সুধীর সরকারদের গোমাংস খাওয়ানো দেখালে সমস্যা মিটবে কি?

—শঙ্কর আচার্য,
কলকাতা-৬।

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা

স্বস্তিকা পত্রিকার পূজা সংখ্যা (৬৮ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৭ আশ্বিন ১৪২২, ৫ অক্টোবর ২০১৫) হাতে এল। সুসজ্জিত এবং নানা স্বাদের রচনায় পুষ্ট পত্রিকাটি অন্যান্যবারের মতো এবারেও পাঠক-পাঠিকাদের মনের খোরাক মেটাতে সহায়তা করবে বলে মনে করি। যেসব রচনাগুলি মনে রেখাপাত করেছে তাদের মধ্যে শেখর সেনগুপ্তের উপন্যাস 'নৈরাজ্য' এবং শেখর বসুর গল্প 'কণিকার স্বপ্ন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও, ভালো লেগেছে বরুণ দাসের দুর্গা : রাষ্ট্র পরিকল্পনার নিখুঁত ছবি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা স্পষ্ট হয় রমেশ পতঙ্গে লিখিত 'সঙ্ঘসাধনা ও তার সমালোচকরা' নিবন্ধে। ভালো লাগে ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর হলোকষ্ট : ইউরোপে খৃষ্টানদের ব্যাপক ইহুদি নিধন যজ্ঞ, অমলেশ মিশ্রের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন, অচিন্ত্য বিশ্বাস রচিত মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস— রবীন্দ্রনাথের সন্ধান, অর্ণব নাগের সেকালের মেসবাড়ি, বিকাশ ভট্টাচার্যের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত। পৌরাণিক কাহিনির প্রেক্ষাপটে বিজয় আঢ্য লিখিত এক রূপান্তরিত পুরুষের কথা অপূর্ব রচনা।

দেবব্রত ঘোষ লিখিত 'বিজ্ঞানের আলোয় অবতার তত্ত্ব' নিবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য পেশ করতে ইচ্ছা করি। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। তিনি বিজ্ঞানের যুক্তিতে অবতারবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু, লেখাটি পড়ে মনে হয়েছে যে তিনি একটি গোলাকার গর্তে চৌকো জিনিস প্রবেশ করাবার চেষ্টা করেছেন। এখানে যুক্তি-বিশ্লেষণের চাইতে বিজ্ঞানের তথ্যে লেখাটি ভারাক্রান্ত হয়েছে।

এই প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'কলা ছিল মানুষের আদিমতম খাদ্য এবং কলাগাছের প্রধান শত্রু ছিল কেঁচো জাতীয় কীট। নৃসিংহ (বা নরসিংহ) তার নখের মাধ্যমে কেঁচোদের ধ্বংস করে ভাবি মানুষদের আদিখাদ্যকে রক্ষা করতো বলেই সে অবতাররূপে স্বীকৃত।' নৃসিংহ অবতারের সময় কেঁচো ছিল এখনো আছে। একজন অবতারপুরুষের অবতরণ করা কি কেঁচো মারার জন্য? আমাদের শাস্ত্র কি তাই বলেছে? এইরকম হাস্যকর ব্যাখ্যা লেখক মহাশয় না উপস্থাপন করলেই পারতেন।

অন্য একটি স্থানে লেখক বলেছেন, 'এবার এলেন ষষ্ঠ অবতার যিনি পূর্ণ মানুষের রূপধারী। তিনিই শাস্ত্রকথিত পরশুরাম। তাঁর হাতে কুঠার যা দিয়ে তিনি নিজের মাকে হত্যা করেছিলেন বলে পুরাণে কথিত। তার আসল অন্তর্নিহিত অর্থ হলো কুঠার বা লাঙ্গল হস্তে জীব ধরিত্রী-মাতার (অর্থাৎ পৃথিবীর) মাটিকে রেণু রেণু করেছিলেন, যাতে মাটি চাষযোগ্য হয়।' পিতা জমদগ্নির আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন। আবার অন্যদিকে পিতা সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চাইলে মায়ের পুর্নজীবন প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ মায়ের প্রাণ দান করেছিলেন। যিনি প্রাণ শুধু নিতে পারেন ফিরিয়ে দিতে পারেন না তাকে হত্যাকারী বলে। তাহলে এক্ষেত্রে কি পরশুরামকে হত্যাকারী বলা চলে?

আর পরশু শব্দের অর্থ— অস্ত্রবিশেষ, কুঠার, টাঙ্গি, পর (শত্রু)-শৃ (বধ করা) + ডু কর্তৃ। (সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত সরল বাঙ্গালা অভিধান) কুঠার বা পরশু দিয়ে কি মাটি চাষ করা যায়? না লাঙ্গল দিয়ে চাষ হয়? এইভাবে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা অনুচিত। এছাড়াও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ল, তাহল ২৩ পৃষ্ঠায় '...অহিংসা, আক্রোশ ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করতে হবে।' 'যেরকম আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে সেরকম সৃষ্টির সব প্রার্থীরই আছে।' প্রার্থীর স্থলে প্রাণী হবে' (পৃ. ২৩)। 'ব্যাখ্যা : অহিংসা, সত্য, অস্রেয়, ব্রহ্মচর্য এই ব্রত প্রত্যেক মহিলা, পুরুষ, শিশু সবার পালন করা উচিত।' অস্রেয়র স্থলে অস্তেয় হবে। (পৃ. ২৪)

—কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,
উত্তরপাড়া, হুগলী।

কোচবিহারের মদনমোহন রাস।

কোচবিহারের মদনমোহনদেবের রাসমেলা

সুজিত চক্রবর্তী

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কোচবিহার ছিল এক দেশীয় রাজ্য। সেই মহারাজদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে গোটা উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম পূর্ণাঙ্গ মেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের পুজো। এই পুজো উপলক্ষে রাসপূর্ণিমা তিথিতে কোচবিহার শহরে প্রতিবছর বসে কোচবিহারের 'রাসমেলা।' কোচরাজাদের কুলদেবতা হলো শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুর। এক মহামিলনোৎসবের মিষ্টিমধুর সুর বেজে ওঠে এই মেলাকে ঘিরে। দেখা যায় উত্তরবঙ্গে ছয়টি জেলায় প্রায় ৫৭২টি মেলা হয়। এইসব মেলার সঙ্গে মিশে যায় একটি ঐতিহ্যের ফল্গুধারা। মেলাগুলিতে ফুটে ওঠে নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের প্রতিচ্ছবি। মেলা চলে প্রায় এক কিংবা দুই মাস বা পক্ষকালব্যাপী ধরে। পর্যটকদের কাছেও এই মেলা দারুণ আকর্ষণীয়। উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক সুবাস পেতে সকলকেই আসতে হবে এই মেলায়।

মেলার সূচনাপর্ব সম্বন্ধে তৎকালীন বা বর্তমান পণ্ডিতমহলে প্রচুর মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতমহলের অভিমত, কোচবিহারের ১৭তম মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের (১৭৮৩-১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) আমলেই এই মেলার সূচনা হয়েছিল। বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত জয়নাথ মুন্সী রচিত গ্রন্থখানিতে 'রাজোপাখ্যান'-এ কোচবিহারের

রাসমেলার সূচনাপর্ব সম্পর্কে যে অভিমত দেওয়া হয়, '৩০১ রাজসকে বাঙ্গালা (ইং ১৮১২ খৃষ্টাব্দ) সালে রাজবাড়িতে অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ভৌতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। তাই শ্রীশ্রী মহারাজ (হরেন্দ্রনারায়ণ) তখন সিঙ্গাজানী মওয়ামারী দুই তালুকের মাঝখানে ভেটাগুড়ি নামে একটি নদীর চড়ার মধ্যে নতুন করে রাজধানী ও অতীব সুন্দর এক রাজবাড়ি নির্মাণ করেন।'

অগ্রহায়ণ মাসে কার্তিক-পূর্ণিমায় রাসযাত্রার দিবসে সন্ধ্যাকালে ভূপতি স্বজন সহযোগে নতুন বাসস্থানে যাত্রা করেন। সেই স্থানেই রাসযাত্রা চলতে লাগল। শত ২ সওয়াড়ি সহ অশ্ব ও গজের আরোহণ করে এই চলা। সুতরাং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বর্তমানের কোচবিহার শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে ভেটাগুড়ি গ্রামে কোচবিহারের রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতার দিন থেকেই কোচবিহারের রাসমেলার সূচনা হয়েছিল।

১৮৮৯ সালে ৮ জুলাই এক অসাধারণ রাজকীয় সমারোহের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির গায়ে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মন্দিরটির নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ১৮৯০ সালের ২১ মার্চ এক অনাবিল আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে কোচবিহার রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরপর থেকেই

শুরু হয় নিত্যপুজো। চিরাচরিত প্রথা মেনেই রাসপূর্ণিমার দিন এখানে মেলার উদ্বোধন করতেন মহারাজা। পূজা-অর্চনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মহারাজা রাসমঞ্চটি (রাসচক্র) ঘোরাতেন। আর তারপরই জনসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হোত মন্দিরের প্রবেশপথ। হিন্দু-মুসলমান সব সমাজের অবাধ প্রবেশ এই মদনমোহন বাড়ির মন্দির চত্বরে। কোচবিহার অ্যাডমিনিসট্রেটিভ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কৃষ্ণনগরের দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা তৈরি নানান ধরনের দেবদেবীর মাটির মূর্তি দিয়ে সাজানো হোত মদনমোহন বাড়ির এই ঠাকুর বাড়িকে।

স্বাধীনতার পর কোচবিহারের রাজশাসনের অবসান হয়। কোচবিহার তখন ভারতভুক্ত এক রাজ্যে পরিণত হয়ে পরে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। আর তারপর থেকেই এ মেলার সূচনা বা উদ্বোধন করে থাকেন রাজ্যের কোনো মন্ত্রী বা জেলা শাসক।

আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত রাসমেলার সঙ্গে কোচবিহারের রাস উৎসবের বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যেমন নবদ্বীপে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কোচবিহারে যাকে কেন্দ্র করে এই মেলা বসে তিনি হলেন কোচরাজবংশের কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই একরূপ শ্রীশ্রী মদনমোহন। এখানে তিনি রাধা বিহীন। তবে পরবর্তীকালে কোচ রাজাদের রাজধানী ক্রমশ স্থানান্তর লাভ করে এবং দেখা যায় যে বর্তমানে যে জায়গায় কোচবিহার শহর এখানেই বর্তমান রাজধানী স্থাপন করেন। ফলে রাজন্যবর্গের দ্বারা আয়োজিত রাসমেলারও স্থানের পরিবর্তন ঘটে।

১৮৯০ সালে ৪ মে সেই সময়ের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ শহরের বৈরাগী দীঘির পাড়ে বর্তমানে মদনমোহন ঠাকুর বাড়ির উদ্বোধন করেন। আর সেই থেকে এই বৈরাগী দীঘির পাড়ে শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন স্থানেই মেলা বসে আসছে। পরে অবশ্য মেলার জনসংখ্যা, কলেবর বেড়ে যাওয়ায় ১৯১৬ সাল থেকে এই মেলা বসে প্যারেড গ্রাউন্ডের স্থানে। আজও ধারাবাহিকভাবে ওই মাঠেই রাসমেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তাই আজ মাঠটি রাসমেলার মাঠ নামে পরিচিতি অর্জন করে ফেলেছে। অতীতে এই মেলাকে ঘিরে যে এক অদ্ভুত উন্মাদনা ছিল আজ হয়তো তার জৌলুস অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছে কালপ্রবাহের আবর্তে।

আজও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, এই মেলা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করলে ফুটে ওঠে এক সরল, অনাড়ম্বর, সহজ সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্থ এখানকার মানুষের নিরলস আনন্দ ও সাদামাঠা গতানুগতিক জীবন যাত্রার প্রবাহের বাইরে এক নতুন বৈচিত্র্যের আস্বাদ। এই মেলায় দেখার মতো অবিস্মরণীয় দৃশ্য যেমন, সারাদিন মেলা ঘুরে দোকানে বসে দই-চিঁড়ে খাওয়া, গোরুর গাড়িতে চড়ে রাসমেলায় আসা-যাওয়া, এখানেই রাত্রিযাপন, কীর্তন, কবিগান, যাত্রা শুনে সে প্যান্ডেলেই রাত্রি কাটিয়ে পরদিন ঘরে ফেরা। আসলে হারিয়ে যেতে নেই মানা মনে মনে। তাই তো ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই কোচবিহারে রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এ মেলায় জনসমাগমও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এমনকী নেপাল, ভুটান ও বাইরের রাজ্য থেকেও মানুষ আসতে থাকেন। যদিও তাদের মানসিক চিন্তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন কেউ আসেন এই মিলন উৎসবে নিজেদের মেলাতে আবার কেউ আসেন পণ্যের পসরা নিয়ে নিজের বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে ১৯৯৪ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের বিগ্রহটি চুরি হয়ে যায়। সঙ্গে চুরি হয় সোনার ছাতাটিও। তথাপি সেই বছরও এই মেলাটি বন্ধ হয়ে যায়নি তার একটাই কারণ, দুষ্কৃতীরা মদনমোহন ঠাকুরকে চুরি করলেও মানুষের মনের মাঝে বসে থাকা মদনমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা বিশ্বাসকে চুরি করতে পারেনি। পরের বছরই পূর্বের মূর্তির আদলে একটি অষ্ট ধাতুর বিগ্রহ ও সোনার ছাতা মন্দিরে পুনরায় স্থাপন করা হয়। যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য কোচবিহারের রাসমেলা সর্বজনীন মাত্রা লাভ করেছে তা হলো এখানে সকল জাতির মেলবন্ধন। এ এক যেন বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য। প্রায় ৩০ ফুট উঁচু এই রাসচক্রটি দেখতে অনেকটা মিনারের ন্যায়। এই রাসচক্রটি দেখতে বেশ সুদৃশ্য এবং সুন্দর এক অস্তিত্বের প্রতীক হিসেবে বর্তমান।

বাঁশ আর কাগজের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে নির্মিত এই চক্রটি। প্রথা মেনে অর্থাৎ অতীতের অনুসরণ করে প্রতি বছর এই রাসচক্রটি নির্মাণ করেন এক মুসলিম পরিবার। যা এক অদ্ভুত সংহতির— মিলনের প্রকৃত অর্থটাকেই বাস্তবের সঙ্গে মেলে ধরে। যার টানেই কোচবিহারের এই শ্রীশ্রী মদনমোহন মন্দিরটি আজ এক অন্য মাত্রায় নিজেকে তুলে ধরেছে। সেই সঙ্গে এই রাসমেলার মিলন উৎসবটিও এক সমন্বয়ের মহোৎসবে পরিণত হয়েছে অতীত থেকে আজও।

(সৌজন্যে 'আলিপুর বার্তা')

পৌরাণিক চরিত্র

ঘটোৎকচ-জননী হিড়িম্বা

রূপশ্রী দত্ত

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ এক বিরাট যোদ্ধা ছিলেন। তিনি মহাভারতের এক বিশিষ্ট চরিত্র।

ঘটোৎকচ-জননীর নাম হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র। পাণ্ডবেরা সেসময় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। গহন অরণ্যে একদিন তাঁরা বৃক্ষতলে বিশ্রামরত। ভীম তাঁদের পাহারায় ছিলেন। অনতিদূরে ভাই হিড়িম্ব ও ভগ্নী হিড়িম্বা একটি মানুষের গন্ধে

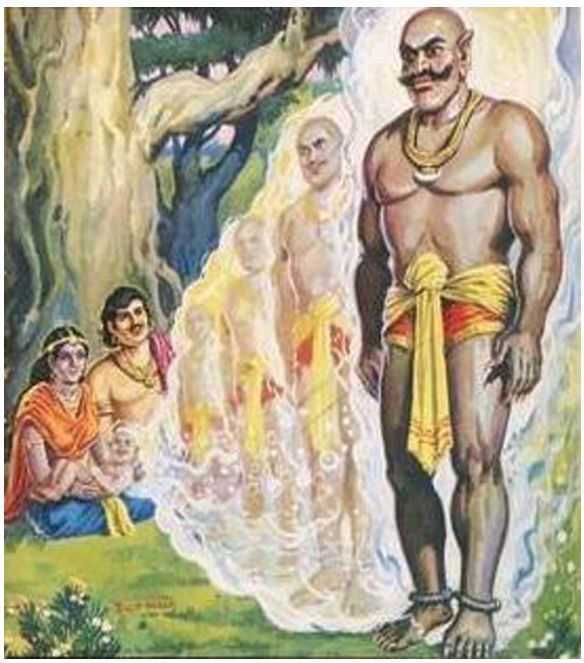

চঞ্চল হয়ে ভগ্নী হিড়িম্বাকে খোঁজ নিতে পাঠালেন। হিড়িম্বা বললেন— 'এই গহন বনে মানুষ কোথা থেকে আসবে। তাছাড়া তোমার ভয়ে এখানে কেউই আসবে না।' হিড়িম্বের বারংবার বলার ফলে, হিড়িম্বা বাইরে বেরোলেন। হিড়িম্বা যদিও রাক্ষসবংশ সম্ভূতা কিন্তু কুদর্শনা ছিলেন না। তবুও তিনি সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশ ধরলেন। রাক্ষসসুলভ নরখাদক প্রবৃত্তিও তাঁর অনেকটাই কম ছিল।

হিড়িম্বা কিছু দূরে যেতেই নিদ্রিত পাণ্ডব ও জননী কুন্তীকে দেখতে পেলেন— দেখলেন বলিষ্ঠদেহী পাহারারত ভীমকেও। ভীম ওই গহন বনে সুন্দরী নারী দেখে বিস্মিত হয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। হিড়িম্বা আত্মপরিচয় দিলেন এবং ভাই হিড়িম্বের অভিপ্রায়ও জানিয়ে দিলেন। হিড়িম্বা তাদের পালাতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, ভীম কাপুরুষের ন্যায় পালাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এদিকে ভগ্নীর খোঁজে হিড়িম্ব এসে দেখতে পেল, হিড়িম্বা ভীমের সঙ্গে কথোপকথনে রত। ভীম ও হিড়িম্বের যুদ্ধে, হিড়িম্ব নিহত হলো। হিড়িম্বা কুন্তীর নিকটে গিয়ে বাক্যালাপ শুরু করলেন। কুন্তী ও হিড়িম্বার স্বভাবমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে, ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার পরিণয় প্রস্তাবে সায় দিলেন। ভীম প্রথমে অসম্মত হয়ে পরে তাকে বিবাহ করলেন। শর্ত ছিল, সন্তানজন্মের পর তাঁদের জীবন বিচ্ছিন্ন হবে। ঘটোৎকচ জন্মের পর ভীম অন্যত্র চলে যান।

হিড়িম্বা একক প্রচেষ্টায় ঘটোৎকচকে যুদ্ধ ও অন্যান্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তোলেন। ঘটোৎকচ ইন্দ্রজাল-বিদ্যাও শেখেন। কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে বলেন, এই মায়াবিদ্যায় এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না।

(২)

একদিন ঘটোৎকচ মাতৃভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ভাবল, মা অনেকদিনই নরমাংস খান না— একদিন যদি তাঁকে খাওয়ানো সম্ভব হয়। এক পরিবারের সঙ্গে গোপনে ঘটোৎকচ যোগাযোগ করল। কিন্তু, তারা কেউই আত্মবলি দিতে রাজি হলো না। শুধু তাদের মধ্যম ভ্রাতা এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলো। সে ঘটোৎকচের অনুমতি নিয়ে স্নানে গেল। দীর্ঘসময় সে না আসায় ঘটোৎকচ তার ডাকনাম 'মধ্যম' বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল। আবার এই 'মধ্যম' নামটি তার পিতা ভীমেরও ডাক নাম। নিজ নাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনে, ভীম সত্বর সে স্থানে এলেন। ভীম সমস্ত ব্যাপার জানলেন— হিড়িম্বাও সে স্থানে এলেন। ভীমকে দেখে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল— তিনি নরমাংস ভক্ষণে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হলেন। আবার তাঁদের জীবনধারা দুই দিকে প্রবাহিত হতে লাগল।

(৩)

আর একদিন, ঘটোৎকচ-হিড়িম্বার আবাসস্থলের কাছাকাছি এলেন সুভদ্রা ও পুত্র অভিমন্যু। ঘটোৎকচ তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্কের কথা জানতেন না। তিনি তাঁদের প্রবেশাধিকার দিলেন না। হিড়িম্বা এসে সব কথা জেনে ভীমের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেবার পর, সকলেই পরিজন সম্মেলনের আনন্দলাভ করলেন। এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সংস্কৃত নাট্যকার ভাস-এর 'মধ্যমব্যায়োগ' নাটকে।

রাক্ষসবংশীয়া হয়েও, হিড়িম্বার মানবীসুলভ আচরণ, পতিনিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি আদৌ রাক্ষসবংশসম্ভূতাসুলভ উগ্রস্বভাবা ছিলেন না। সংযত নম্রতা ও ত্যাগ স্বীকার, তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ। আকৃতি প্রকৃতিতে কোথাও তাঁর ভীতিপ্রদ বা ভয়াবহতা ছিল না। বীরপুত্রের তিনি ছিলেন সুযোগ্য জননী।

হিমাচলপ্রদেশে হিড়িম্বা দেবীরূপে পূজিতা হন। মানালিতে তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির আছে। ■

বোকা বুড়ি

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ি। তারা ভারি গরিব। বুড়ি বেজায় বোকা আর ভয়ানক বেশি কথা বলে। যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। তার পেটে কোনো কথা থাকে না।

বুড়ো একদিন তার জমি চষ্‌তে চষ্‌তে মাটির নিচে এক কলসি পেল। সেই কলসি ভরা টাকা আর মোহর! তখন তার ভারি ভাবনা হলো— এ টাকা যদি ফেলে রাখি কোনোদিন কে চুরি করে নেবে। আর যদি

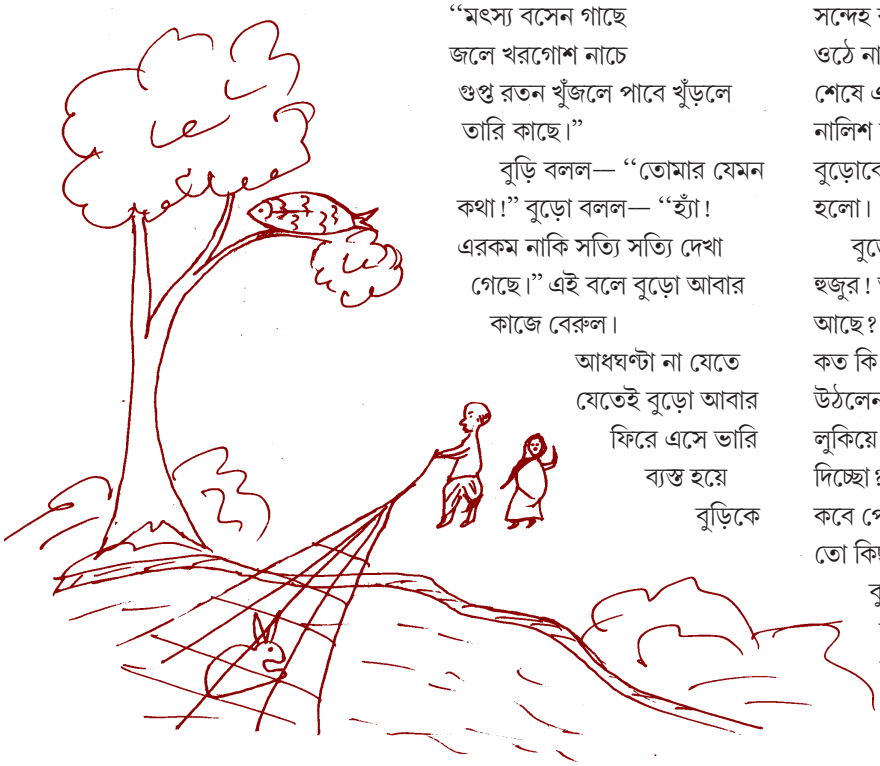

টাকা বাড়ি নিয়ে যাই, বুড়ি টের পেয়ে যাবে। সে সকলের কাছে তার গল্প করবে, ক্রমে কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লে রাজার কোটাল এসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যাবে। ভেবে ভেবে সে এক ফন্দি আঁটলে। সে ঠিক করল যে বুড়িকে সব কথা বলবে কিন্তু এ রকম উপায় করবে যাতে বুড়ির কথা কেউ না বিশ্বাস করে।

তখন সে একটা মাছ কিনে এনে তার ক্ষেতের ধারে একটা গাছের উপর বেঁধে রাখল, আর একটা খরগোশ এনে নদীর ধারে একটা গর্তের মধ্যে জাল দিয়ে জড়িয়ে রাখল, তারপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল— একটা ভারি আশ্চর্য খবর শুনলাম, গাছের গায়ে নাকি মাছ উড়ে বসে আর খরগোশ নাকি জলে খেলা করে। আমাদের গণক ঠাকুর বলেন—

"মৎস্য বসেন গাছে
জলে খরগোশ নাচে
গুপ্ত রতন খুঁজলে পাবে খুঁড়লে
তারি কাছে।"

বুড়ি বলল— "তোমার যেমন কথা!" বুড়ো বলল— "হ্যাঁ! এরকম নাকি সত্যি সত্যি দেখা গেছে।" এই বলে বুড়ো আবার কাজে বেরুল।

আধঘণ্টা না যেতে যেতেই বুড়ো আবার ফিরে এসে ভারি ব্যস্ত হয়ে বুড়িকে সেই টাকা পাওয়ার কথা বলল। তখন বুড়ো বুড়ি মিলে টাকা আনতে চলল। পথে যেতে যেতে বুড়ো সেই গাছতলায় এসে বলল, "গাছের উপর চক্‌চক্‌ করছে কি?" এই বলে সে একটা ঢিল ছুঁড়তেই মাছটা পড়ে গেল। বুড়ি তো অবাক! তখন বুড়ো বলল, "নদীতে জাল ফেলেছিলাম, মাছ-টাছ পড়ল কিনা দেখে আসি।" জাল টানতেই— ওমা! খরগোশ যে! তখন বুড়ো বলল— "কেমন! গণক ঠাকুরের কথা আর অবিশ্বাস করবে?" তারপর টাকা নিয়ে তারা বাড়ি এল।

টাকা পেয়েই বুড়ি বলল— "ঘর করব, বাড়ি করব, গহনা বানাব, পোশাক কিনব।" বুড়ো বলল— "ব্যস্ত হয়ো না— কিছুদিন রয়ে-সয়ে দেখ— ক্রমে সবই হবে। হঠাৎ অত কাণ্ড করলে লোকে সন্দেহ করবে যে।" কিন্তু বুড়ির তাতে মন ওঠে না— সে একে বলে, ওকে বলে। শেষে একবারে কোটালের কাছে নালিশ করে দিল। কোটালের হুকুমে বুড়োকে হাতকড়া দিয়ে হাজির করা হলো।

বুড়ো সব কথা শুনে বলল— "সেকি হুজুর! আমার স্ত্রীর কি মাথার কিছু ঠিক আছে? সে তো ওরকম আবোল তাবোল কত কি বলে।" কোটাল তখন তেড়ে উঠলেন— "বটে, তুমি টাকা পেয়ে লুকিয়ে রেখেছ আবার বুড়ির নামে দোষ দিচ্ছো?" বুড়ো বলল— "কিসের টাকা? কবে পেলাম? কোথায় পেলাম? আমি তো কিছুই জানি না।"

বুড়ি বলল— "না তুমি কিছুই জান না? সেই যেদিন গাছের ডালে মাছ বসেছিল, নদীতে জাল ফেলে খরগোশ ধরলে— সেদিনের কথা তোমার মনে নেই? কচি খোকা আর কি।" তাই শুনে সবাই হাসতে লাগল। কোটাল এক ধমক দিয়ে বুড়িকে বলল— "যা পাগ্‌লি, বাড়ি যা! ফের যদি যা-তা বলবি তোকে আমি কয়েদ করে রাখব।"

বুড়ি তখন বাড়ি ফিরে গেল। কোটালের ভয়ে সে আর কারু কাছে টাকার কথা বলত না।

রাজ্য পরিচিতি

তামিলনাড়ু

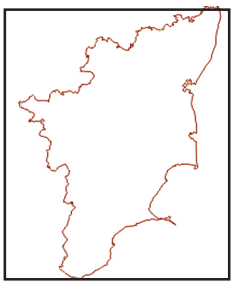

বঙ্গোপসাগর ও ভারতমহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই রাজ্য। পশ্চিমে কেরল এবং উত্তরে অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক রাজ্য। আয়তন ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৮ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৭ কোটি ২১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৫৮ জন। রাজধানী চেন্নাই। ৮০ শতাংশ লোক শিক্ষিত। ভাষা তামিল। নীলগিরি ও মলয়গিরি প্রধান পর্বত। নদীর মধ্যে কাবেরী, তাম্রপর্ণী ও পেন্নার প্রধান। রামেরম্, মাদুরাই, মহাবলীপুরম্, পক্ষীতীর্থ, কুম্ভকোণম্, তঞ্জাভুর, কন্যাকুমারী ও পণ্ডীচেরী তীর্থক্ষেত্র ও দর্শনীয় স্থান। বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন, গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজম্, সাধক রামানুজাচার্য, সাহিত্যিক ও রাজনীতিজ্ঞ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এবং বিখ্যাত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এ রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্নবাণ

১.কত সালে বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়?

২.'ম্যান বুকার ২০১৫' বিজেতা কে?

৩.লন্ডন কোন নদীর তীরে?

৪.'কাছের মানুষ' কার লেখা?

৫.'কাটুম-কুটুম'—কার শিল্পশৈলী?

উত্তর : ১. ১৯৮৯ সালে। ২. মারলন জেমস। ৩. টেমস। ৪. সুচিত্রা ভট্টাচার্য। ৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছবিতে অমিল খোঁজ

ছোটদের কলমে

নবান্ন

কেয়া চক্রবর্তী, কাটোয়া

ধান পেকেছে মাঠ ভরা ওই
সোনালী রঙের মেলা
সকালবেলা চাষির ছেলে
করছে দেখ খেলা।

ধান কাটতে যায় চাষি
সঙ্গে চাষির বউ
আরও যারা যাচ্ছে মাঠে
তাদেরও আছে কেউ।

ধান উঠবে গোলা ভরা
থাকবে না কেউ দুখী
ঘর-সংসার নিয়ে সবাই
হবে ভীষণ সুখী।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

নারী প্রগতির অনন্য উদাহরণ অবলা বসু

রিনি রায়

আমাদের সংস্কৃতিতে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হিসাবে সর্বত্র উপস্থাপিত হয়ে এসেছে। শিব-পার্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা— কেউই পরস্পরকে ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই ধারণারই প্রকাশ ঘটেছে অর্ধনারীশ্বর রূপকল্পনার মাধ্যমে। এই রূপকল্পনা কেবল পুরাণের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, ভারতে কালে কালে এর দেখা মেলে। এমনকী আধুনিক কালেও এর ব্যতয় ঘটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার জীবন এর উদাহরণ। সবার জীবনেরই সাফল্যের পিছনে কোনো না কোনোভাবে নারী তার অনুপ্রেরণার শক্তি জুগিয়েছে। প্রত্যেক সফল পুরুষের পিছনেই থাকে একজন নারী যিনি কখনও মা, কখনও পত্নী, কখনও কন্যা আবার কখনও বা বন্ধু রূপে তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে পুরুষকে পৌঁছে দিয়েছে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে।

মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক ভারত যখন পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-অধ্যাত্ম-বিপ্লবের পথে ক্রমঅগ্রসর হচ্ছে, তখন তাকে আরও অত্যুজ্জ্বল করে তুলতে ভারতমাতার বহু কৃতী সন্তান তাতে যোগদান করেন। ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সেই সকল ব্যক্তির অবদানের নেপথ্যে কোনো না কোনোভাবে নারী তাকে সহায়তা করেছে। বহু খ্যাত-অখ্যাত দম্পতির নিরলস সাধনায় আজ ভারতবর্ষ বিশ্বে এক সমীহের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এরকমই এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য দম্পতি হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর সহধর্মিণী অবলা বসু। যিনি লেডি অবলা বসু নামেই সমধিক পরিচিত। ইনি ছিলেন ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও চিত্তরঞ্জন দাশের জেঠতুতো ভগিনী।

জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনে মায়ের পরেই যিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনি অবলা দেবী। ইনি

অঙ্গনা

জগদীশচন্দ্রের সুসময়-দুঃসময়- গবেষণায়-বিদেশ ভ্রমণ, সকল কাজের মধ্যে নিঃশব্দে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বেথুন স্কুলের এই কৃতী ছাত্রী কেবলমাত্র মহিলা হওয়ার কারণে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারেননি, ফলত ডাক্তারি পড়ার জন্য তিনি মাদ্রাজে যেতে বাধ্য হন। সেখানে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনার সময় যখন তিনি চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী, তখন (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিয়ের পর তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেন। বিবাহোত্তরকালে তাঁদের সন্তান মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তিনি তাঁর স্বামীর জীবন ও বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নেন। সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন থাকতে এবং নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তিনি যখনই তাঁর গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বের যেখানেই গেছেন যেখানেই সঙ্গী থেকেছেন, লেডি বসু। পাশে থেকে আত্মিক শক্তি জুগিয়েছেন, লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে নীরবে সর্বদা স্বামীর সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদে সঙ্গী হয়েছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে ভারতীয়-শ্বেতাঙ্গ বিভেদের প্রতিবাদে যখন টানা তিন বছর জগদীশচন্দ্র বেতন নেননি, সেই সময় অবলাদেবী আর্থিক অনটন সামলাতে অত্যন্ত মিতব্যয়িতার সঙ্গে সংসার চালিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র বসু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু হতে পারতেন না, যদি না অবলা বসু তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিতেন। তাইতো স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সর্বগুণসম্পন্না সাধ্বী গৃহিণী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের স্বপ্নের বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব অলঙ্কার এবং সঞ্চিত অর্থ স্বেচ্ছায় দান করেছিলেন। তাঁর অতিথিবৎসল ব্যবহার ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস বুল-সহ আরও বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিকে বসু পরিবারের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। যার ফলস্বরূপ তপস্বী বিজ্ঞানী ভবিষ্যতে তাঁর গবেষণার কাজে এঁদের সহায়তা লাভ করেছিলেন।

এই যশস্বিনী মহিলা শুধুমাত্র সংসারে সুগৃহিণীর ভূমিকা পালন করেই ক্ষান্ত থাকেননি। প্রথিতযশা পিতা ও স্বামীর পরিচয়ের বাইরে নিজগুণে স্বনামে যশস্বিনী হয়েছিলেন। নারীশিক্ষা প্রসার, অসহায় বিধবাদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দুঃখী ও উদ্বাস্তু মহিলাদের জন্য উইমেনস কো-অপারেটিভ সোসাইটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে নারী প্রগতির প্রতিবন্ধকতাগুলিকে জয় করে এবং অন্যান্য আরও বহু নারীকে নিজেদের ভাগ্যকে জয় করার ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি জগদীশচন্দ্রের জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তার জন্য বাঙালি চিরকাল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে। কারণ অবলা বসু না থাকলে হয়তো জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর জীবনে এতদূর পৌঁছতে পারতেন না। জগদীশচন্দ্র বসু এবং লেডি অবলা বসু তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে যেন অর্ধনারীশ্বর রূপের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন। ■

একই দলের মধ্যে অনাবশ্যক বহুমাত্রিক আওয়াজ শুধু রাজনৈতিক বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

বড় রকমের নির্বাচনী পরাজয় ঘটলে রাজনৈতিক দলে দোষারোপের পালা শুরু হয় তা নতুন কিছু নয়। এই দিক থেকে দেখলে সদ্য বিহার নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় ও মহাজোটবন্ধনের চোখধাঁধানো জয়ের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপিতে যে তুমুল শোরগোল চলছে তা অবশ্যম্ভাবী শুধু ছিল না প্রত্যাশিতও ছিল। কিন্তু সেই বিক্ষোভের অভিমুখ যে দিকে যাচ্ছে সেটা আশা করা যায়নি।

প্রত্যাশা করা গিয়েছিল আক্রমণ মূলত দু'টি দিক দিয়ে বা দুটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে আসবে। প্রথমত, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুড়িকে তোপের মুখে রাখা হবে। কেননা তাঁরা বিহারের নির্বাচনী নজর আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এর ফলে বিহারি ও বাহারির উপজাতীয়তাবাদ বা চূড়ান্ত প্রাদেশিকতাবাদ বাজিমাত করেছে। আর এই প্রথম ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রথম নিশানা হবেন অমিত শা, ফলশ্রুতিতে যা মোদীর ওপরও এসে পড়বে। তিনি বাদ যেতে পারবেন না।

আর দ্বিতীয় দিকটা হলো বিজেপি নেতারা হয়ত আর এস এস সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংরক্ষণ সংক্রান্ত বক্তব্যকে নিজেদের মতো করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। কিন্তু হায়! তার বদলে পিতামহ সমিতির সদস্যবৃন্দ তাঁদের প্রান্তিক হয়ে পড়ার ক্ষোভ এই সুযোগে তুমুল ভাবে উগরে দিলেন। এর ফলে একটা নতুন বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ফলে অদক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনায় ভরাডুবির সেই মূল ইস্যুটা রুটির ওপর কিছুটা মাখনের মতো থাকলেও আসলে হয়ে গেল অতি প্রাচীন সমিতির সদস্যদের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার সুযোগ সন্ধান। বলতে দ্বিধা নেই তাঁদের স্বাক্ষরিত ক্ষোভ-পত্রটির আড়ালে বেদনাদায়কভাবে লুকিয়ে ছিল নিজেদেরকে দলের কাছে অপরিহার্য প্রমাণ করার বিক্ষুব্ধ আর্তি। কিন্তু এর ফল হলো বিপরীত। সকলেই বুঝল আজকের তারুণ্যে ভরা ভারতের কাছে মোদীর ইচ্ছাশক্তি, নেতৃত্ব দেওয়ার বিরল দক্ষতার যে আবেদন তা বাদ দিলে বিজেপি দলের আকর্ষণ তাদের কাছে ম্রিয়মান হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই দেখা গেল এই বিদ্রোহ পুরনো স্রোতহীন নদীর মতোই শান্ত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে, দলের এই সব দিকপাল প্রবীণরা মনে করলেই আন্তরিকভাবে দলের মধ্যে এক গঠনমূলক বিতর্কের আবহ তৈরি করতে পারতেন। যেখানে মোদী ও তাঁর সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে ফলপ্রসূ পথনির্দেশ থাকত। হোত সদর্থক পর্যালোচনা। মার্গদর্শকমণ্ডলী কনসেনসাস অর্থে যে 'সর্বসম্মতির' রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলেছেন তা শুনতে খুবই গণতান্ত্রিক হলেও আদৌ কোনো ব্যতিক্রমী ভাবনা নয়। এরই বিপরীতে রয়েছে সমস্ত দেশবাসীকে নিয়ে দৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে এগিয়ে চলার প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার। সেখানে সদাসর্বদা সহমতের বদলে ভারতের দ্রুত উন্নয়নের পথের খানা-খন্দ, কাঁটা-আগাছা, ঘুঘুর বাসা সবই তাঁকে উৎপাটিত করতে করতে যেতে হবে।

মোদী সরকারের বিরুদ্ধে মূলত দুটি অভিযোগ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে থাকলে সমসাময়িক অন্যান্য রাজনৈতিক শ্রেণী বা তার সঙ্গে যুক্ত থাকা নানান প্রসাদভোগীদের তিনি সেভাবে নজর দিচ্ছেন না। তাঁরা অনেকেই তেমন অভ্যস্ত সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে পারছেন না। তিনি অতি কৃপণভাবে শুধু নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ক্ষমতাভোগের অধিকারই সেই ক্রুদ্ধ শ্রেণীকে দিচ্ছেন। অতীতের কংগ্রেস দলের ক্ষেত্রে তার অনুরাগী বা মিত্রবাহিনীকে যেমন ঠিক অ্যাডজাস্ট করে রসেবসে রাখা হোত, এখন সেটি হচ্ছে না। বরঞ্চ মোদীর রাজনৈতিক সুবিধেভোগীদের ক্ষেত্রে বদান্যতা প্রদর্শন কৃপণতার তকমা পেয়েছে। পরিণতিতে দীর্ঘদিন দিল্লীতে যারা দেওয়া- নেওয়ার রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা ক্ষেপে উঠেছেন।

অবশ্য এই সুবিধে শিকারিদের হতাশা দেশের মূল সমাজের ওপর সেভাবে সঞ্চারিত হতে পারেনি। তারা চায় ফল দেখতে। এই ক্ষেত্রে মোদীর ট্র্যাক রেকর্ড কিছুটা এলোমেলো। এখন পর্যন্ত মোদী তাঁর সমস্ত মনোযোগ দেশের অর্থনীতির বিকাশের মূল বনিয়াদটি মজবুত করার দিকেই সংহত করেছেন। এই বনিয়াদের ওপরই অর্থনৈতিক বহুতল ইমারতটি গড়ে উঠবে। শুধু দু'হাতে কোষাগার থেকে দানছত্রের মতো অনুদান বিলিয়ে যাওয়ার জনমোহিনী পথে না গিয়ে তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ফুলে ফেঁপে ওঠার মতো কাঠামো নির্মাণ শুরু করেছেন। প্রত্যাশিতভাবেই এতে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়নি, যার ফলে একটা রব উঠে গেছে— কোথায় কোনো green shoot অর্থে কচি শাখা তো দেখা যাচ্ছে না।

একটা কথা বলা দরকার— এই যে ভবিষ্যতে বাড়তি ফল পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা যা দেশের নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নানান পন্থায় শুরু করা হয়েছে তার যথাযোগ্য প্রচার আজকের এই প্রচারসর্বস্ব দুনিয়ায় খুবই দরকার। পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় এই শুরু হয়ে যাওয়া প্রকল্প ও জনতার একান্ত উপযোগী উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা অনেক দূর এগিয়েছে তার যথাযোগ্য প্রচার দল ঠিক আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে পারেনি।

এর কারণ আবার দুটি। প্রথমত, এতদিনের একমুখী প্রচার- মাধ্যমগুলির নতুন সরকারের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। দ্বিতীয়ত, বিশাল আমলাবাহিনীর মোদীর কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে উদাসীনতা। অন্যদিকে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যকে বিলোপ করার চেষ্টার ফলে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা যথেষ্টই হতাশ। এঁরা বরাবর ভেবে এসেছিলেন সরকারি ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে ব্যবসায়িক ঋণ নেওয়া হয়েছে তা আদতে তাদের প্রতি রাষ্ট্রের উপহার— এখানে ঋণ শোধ ঐচ্ছিক।

কিন্তু এগুলি মূল সমস্যার খণ্ডাংশ মাত্র। একথা বলা ভালো, ২০১৪ সালে যে নির্ণায়ক লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবেই চলতি অবস্থার পরিবর্তন চেয়েই দেশবাসী এনেছিল। কিন্তু বিজেপির অভ্যন্তরেই দ্বিধা রয়েছে। তার ফলে সেখানকার চালু দলীয় জীবন প্রণালীর মধ্যেই মতদ্বৈধ থেকে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বিহারের নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছিল যথারীতি উন্নয়নমুখী কর্মসূচি নিয়ে। কিন্তু হায়! বেশ কিছুটা এগোবার পর খানিকটা মেকি বুদ্ধিজীবীদের তীব্র বিদ্রোহের কারণে হঠাৎ প্রচারের অভিমুখ ঘুরে গেল। ফিরে এল অতি সঙ্কীর্ণতার মেরুকরণের প্রচার যার সঙ্গে না ছিল ২০১৪-র নির্বাচনের সারমর্মের কোনো যোগ, না ছিল উন্নয়নের কর্মসূচির সম্পর্ক। এই দিশাহীনতার সঙ্গে বিহারের বিরাট পরাজয় রাজনৈতিকভাবে অবশ্যই মোদীর ক্ষতি করেছে।

তবুও যে কলরব তোলা হচ্ছে বিহারের ফলাফলই মোদী পতনের শুরু তা বলার সময় এখনও হয়নি। বেশ কিছু রাজনৈতিক যুদ্ধ তাঁকে করতে হবে যার মধ্যে আবার কয়েকটি নিজের দলের মধ্যেই। এখনও পর্যন্ত তা তিনি এড়িয়ে গেছেন।

বিরোধী দলগুলি বিহারের ফলাফল ও তার পাটীগণিতকে সরলীকরণের মাধ্যমে নানান সমীকরণ নাড়াচাড়া করছে। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত জরুরিভাবে মোদীকে তাঁর ও দলের যে কোর বা একান্ত নিজস্ব সমর্থন আছে তাদের সদা সন্তুষ্টি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা তাঁকে চান কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছেন না তাদের দিকেও নজর দিতে হবে। শেষ বিচারে কে দল পরিচালনা করছে তা কখনই সর্বোচ্চ বিচার্য হতে পারে না। বরঞ্চ দল সরকারের সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গত করতে পারছে কিনা সেটাই আসল কথা। নানান গলায় তীব্র স্বরে দলের বক্তব্য পেশ করলে তুমুল বিভ্রান্তির জন্ম হবে। তা আদৌ কাম্য নয়। ■

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

PRAKASH PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member : The National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment & Mutual Funds Advisor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

312/313, Todi Chambers, 2, Lal Bazar Street, Kolkata-700 001

Phone Nos. 2230 0405, 2230 5846, Fax : (033) 2248 1576, E-mail : prakash_laurel@yahoo.com

ঐতিহাসিক ভারত-আফ্রিকা ফোরামের তৃতীয় সম্মেলন

চীনকে টেক্কা দিতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে ভারত

অভিমন্যু গুহ

গত ২৬ থেকে ২৯ অক্টোবর রাজধানী নয়া দিল্লীতে আয়োজিত হলো ভারত-আফ্রিকা ফোরামের তৃতীয় শিখর সম্মেলন। নানা দিক দিয়ে এবারের এই সম্মেলন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত এবারও তার সফল কূটনৈতিক দৌত্য দেখাতে পেরেছে বলেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল মনে করছেন। ২০০৮ সাল থেকে এধরনের সম্মেলন আয়োজিত হলেও ধারে ও ভারে এবারের সঙ্গে বিগত দুটি ভারত-আফ্রিকা ফোরামের শিখর সম্মেলনের কোনো তুলনা টানতেই রাজি নন বিশেষজ্ঞরা। কারণ আফ্রিকান নেশনের ৫৪টি দেশ এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ ১১ কোটিরও বেশি আফ্রিকান মানুষ এবং ভারতবর্ষের দশগুণেরও বেশি আফ্রিকান ভূমি এহেন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করল। এর ওপর ৪০ জন তাবড় রাষ্ট্রপ্রধান, যাঁদের মধ্যে ইজিপ্টীয় প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতহা এলসিসি ও সুদানীয় প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব যাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা ঝুলছে, তারাও ছিলেন। সুতরাং এধরনের বিপুল আয়োজনের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

কূটনৈতিক মহল মনে করছেন আগামীদিনে বিশ্বে বড়ো শক্তি হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এহেন শিখর সম্মেলন এবার যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারত-আফ্রিকার সম্পর্ক বহু প্রাচীন। ভারত ও আফ্রিকা দু'টি রাষ্ট্রই অতীতে ঔপনিবেশকতার বিরুদ্ধে লড়েছে এবং দেশভাগের শিকার হয়েছে। বর্তমানে এই দু'তরফই দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যায় জর্জরিত। সবচেয়ে বড়ো কথা এই দু'দেশই এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করছে। সব মিলিয়ে দু'পক্ষের স্বার্থ কোনো একটা জায়গায় মিলে যাচ্ছে

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

এবং এই সমস্যাগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর তাগিদেই ভারত-আফ্রিকা হাতে হাত মেলাবে এমনটা আশা করাই গিয়েছিল। শুধু একপক্ষের উদ্যোগ দরকার ছিল এবং সেই কাজটি ভারত সঠিকভাবেই করতে পেরেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে দরকারি কাজটি ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে আফ্রিকা মহাদেশের ৫৪টি সদস্যের সমর্থন। এই আয়োজনের পরে মোটামুটি নিশ্চিত যে এদের সিংহভাগ সমর্থনই ভারতের পক্ষে যাচ্ছে। পাকিস্তান-চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক লড়াইয়েও এর ফলে দেশ বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গেল। ভারত- আফ্রিকা ফোরামের তৃতীয় শিখর সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :

প্রাকৃতিক শক্তি

আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ সদস্যই প্রাকৃতিক শক্তিতে বলীয়ান। বিশেষ করে তেল, গ্যাস ও কয়লার ক্ষেত্রে। ভারতে আমদানিকৃত তেল ও গ্যাসের ছয়ভাগের একভাগই এখন আসে আফ্রিকা মহাদেশ, মূলত নাইজেরিয়া থেকে। এছাড়া অ্যানজোলা, ইজিপ্ট, গ্যাবন, লিবিয়া, সুদান, আলজিরিয়া, ইকুয়াটোরিয়াল গায়না, ক্যামেরুন, গায়না, কঙ্গো-ব্রাজ্জাভিলি এবং পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য আফ্রিকা থেকেও এদেশে তেল ও গ্যাস আমদানি করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বর্ষে যে ভারতে আমদানিকৃত তেল ও গ্যাসের ১৬.৫ শতাংশই এসেছে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৮--- এই প্রায় একদশকের কাছাকাছি সময়ে তেল আমদানির ক্ষেত্রে আফ্রিকার ওপর গ্রহণযোগ্য নির্ভরতা বেড়েছে ভারতের। এবারের সম্মেলনে এধরনের সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক কূটনীতিও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। চীন, জাপান, আমেরিকা-সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বহু দেশ এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারকে দখল করবার লোভে আফ্রিকা মহাদেশে বিনিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে তাতে থাবা বসানোর চেষ্টা করছে। এই কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা মাথায় রেখেও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির কথা ভেবেছে ভারত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলির বর্তমানে নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যতম বৃহৎ সহযোগী। এই মুহূর্তে দু'পক্ষের বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৭০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি এবং এই অঙ্কটা ক্রমবর্ধমান। আফ্রিকা মহাদেশে এখন ভারতের অনেকগুলি বড়ো ও নামি প্রতিষ্ঠান যেমন এয়ারটেল, মাহিন্দ্রা, বাজাজ, কার্লোসকার, টাটা, অ্যাপলো, অ্যামিটি প্রভৃতি বহু কোম্পানি বিপুল অর্থের বিনিয়োগ করেছে। বিশেষ করে সবুজ (কৃষি) এবং নীল (সামুদ্রিক) অর্থনীতিতে বিনিয়োগ এই মুহূর্তে আফ্রিকা মহাদেশে ভারতের পক্ষে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় আর্থিক ক্ষেত্র বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। ভারতও ধাপে ধাপে আফ্রিকায় অনুদান ও সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বর্তমানে তা ১১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে দিয়েছে। ওই মহাদেশের ৪১টি দেশে বর্তমানে ভারতের ১৩৭টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প চলছে। আফ্রিকার সমস্যা সঙ্কুল এলাকাতেও ভারতের ২২টি শান্তিরক্ষা প্রকল্প চলছে। সবমিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নির্মাণে ভারত ইতিমধ্যেই বেশ সক্রিয়। বলা বাহুল্য, আগামীদিনে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে ভারত-আফ্রিকা ফোরামের তৃতীয় সম্মেলন সবচেয়ে কার্যকরী হবে বলে বাণিজ্যিক মহলের বিশ্বাস। তথ্য বলছে ২০০৫ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ভারত-আফ্রিকার বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং চলতি আর্থিক বছরের শেষে তা ১ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে বলে আশা প্রকাশ করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

অর্থনীতি

একথা বলার কোনো দরকার পড়ে না যে প্রাকৃতিক শক্তি আমদানি- রপ্তানি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের এই বিপুল উন্নতি দু'দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করবে। একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ২০১৩ সালে আফ্রিকা মহাদেশে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫ শতাংশ, এ বছরের শেষে তা ৩.৯ শতাংশে এবং আগামী বছরে তা ৫ শতাংশে পৌঁছে যাবে বলে সমীক্ষকরা মনে করেছেন।

পরিসংখ্যান-১

আফ্রিকার বৃহৎ অর্থনীতি

নাইজিরিয়া	৫৯৪ বিলিয়ন ডলার
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৪১ বিলিয়ন ডলার
মিশর	২৭৫ বিলিয়ন ডলার
আলজিরিয়া	২১৯ বিলিয়ন ডলার
অ্যাঙ্গোলা	১২৯ বিলিয়ন ডলার
মরক্কো	১১৪ বিলিয়ন ডলার
লিবিয়া	১১৪ বিলিয়ন ডলার
সুদান	৫৩ বিলিয়ন ডলার
কেনিয়া	৫৬ বিলিয়ন ডলার
ইথিওপিয়া	৫১ বিলিয়ন ডলার
ঘানা	৫০ বিলিয়ন ডলার
তিউনেশিয়া	৪৫ বিলিয়ন ডলার

পরিসংখ্যান-৩

সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

(১) বোকো হারাম
(২) আল সাবাব
(৩) ইসলামিক স্টেট (আই এস) সংক্রান্ত গোষ্ঠী
(৪) আল কায়দা ইন দ্য ইসলামিক মাঘরেব
(৫) মুভমেন্ট ফর ইউনিটি অ্যান্ড জিহাদ ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা

পরিসংখ্যান-৪

আফ্রিকায় ভারত

ভারতীয় বংশোদ্ভূত	২২ লক্ষ
শান্তি রক্ষা প্রকল্প	২২টি ক্ষেত্রে
কার্যকরী	
বাণিজ্য	৭০ বিলিয়ন ডলার
বিনিয়োগ	৩০ বিলিয়ন ডলার

পরিসংখ্যান-২ খনিজ		
অঞ্চল	**খনিজ**	**আন্তর্জাতিক উৎসের শতাংশ**
উত্তর আফ্রিকা	ফসফেট	৩২
পশ্চিম আফ্রিকা	বক্সাইট	৪০
	ইউরেনিয়াম	৫
	প্রাকৃতিক লোহা	৪
মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা	প্লাটিনাম	৮৮
	ক্রোমিয়াম	৮৪
	হীরে	৬০
	সোনা	৪০
	ইউরেনিয়াম	১৩
	কপার	৫

স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব জুড়ে চলা আর্থিক মন্দার প্রকোপ থেকে আফ্রিকা মহাদেশ নিজেদের বের করে নিতে পেরেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে ভারত-আফ্রিকার সঙ্গে তিনটি পর্যায়ে যুক্ত। যথা, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং ভারত-আফ্রিকা ফোরাম শিখর সম্মেলনের মাধ্যমে প্যান-আফ্রিকা দ্বারা। এর মধ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এতে ইকোনমিক কমিউনিটি অব্ ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস্ (ইসি ও ডব্লিউ এ এস), কমন মার্কেট ফর ইস্টার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন আফ্রিকা (সি ও এম ই এস এ) প্রভৃতি শক্তিশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলি এর সঙ্গে জড়িত। ২০০৮ সালে প্রথম ভারত-আফ্রিকা ফোরামের শিখর সম্মেলনে ভারত স্বল্প উন্নত দেশগুলির জন্য শুল্ক মুক্ত বাজারের প্রস্তাব করেছিল।

কিন্তু পরিস্থিতি এবার পুরো পাল্টে গিয়েছে বছর দু'য়েক আগে আগামী অর্ধশতাব্দীর দিকে লক্ষ্য রেখে আফ্রিকা তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য স্থির করেছে অ্যাজেন্ডা ২০৬৩-কে সামনে রেখে। এবং একই সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে অতি সম্প্রতি তৈরি করেছে স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য বা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এস ডি জি) ২০৩০। স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এবারের শিখর সম্মেলনে দু'দেশের অর্থনৈতিক ধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, রুখতে পরিকল্পনা, শক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, পুর্ননবীকরণ শক্তি, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল ইত্যাদি পুর্নগঠনের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে যা দু'দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও মজবুত করবে বলে অর্থনীতিবিদদের আশা।

সন্ত্রাসবাদ

ভারত ও আফ্রিকা—দু'তরফের কাছেই এই মুহূর্তে সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ। আফ্রিকা মহাদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বিপুল এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বোকো হারামের মুক্তাঞ্চল গঠিত হয়েছে এইসব মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে। তৃতীয় শিখর সম্মেলনে ভারতের লক্ষ্য ছিল এই উপদ্রুত এলাকাগুলিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমান গোষ্ঠী গঠন করে সন্ত্রাসবাদকে প্রশমিত করা। স্বাস্থ্য বিষয়ে ভারত-আফ্রিকার সম্পর্ক কয়েক শতাব্দী প্রাচীন বলে ইতিহাসবিদরা জানিয়েছেন। এবং এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করেই আফ্রিকা মহাদেশের সন্ত্রাসবাদ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে ভারত।

ভুললে চলবে না, আফ্রিকা মহাদেশের ৫৪টি সার্বভৌম দেশের হরেক কিসিমের বিদেশ নীতি রয়েছে। এই নীতি কোনোভাবেই যাতে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ভারত। সন্ত্রাসবাদ রুখতে আফ্রিকা মহাদেশকে এক বিন্দুতে আনাই ছিল ভারত-আফ্রিকা ফোরামের তৃতীয় শিখর সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য। কতদূর সফল হওয়া গেল ভবিষ্যতেই তার জবাব দেবে।

চীনকে রুখতে

২০০৬ সালে প্রায় পঞ্চাশ জন মতো আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতাকে বেজিং-এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মূলত আফ্রিকার অর্থনীতিকে গ্রাস করাই ছিল চীনের প্রাথমিক লক্ষ্য। এরপরেই দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশে চীনা বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। ২০১৩ সালে আফ্রিকার সঙ্গে চীনের বাণিজ্য হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের। চলতি বছরে তা একলাফে দ্বিগুণের কাছাকাছি ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার মার্কিন ডলারে পৌঁছে যেতে পারে বলে ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী মহাদেশের দেশগুলিতে আর্থিক বিনিয়োগ বাড়িয়ে মহাসাগরে আধিপত্য কায়েমই হলো চীনের প্রাথমিক লক্ষ্য।

বিশিষ্ট এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেছেন, আফ্রিকা মহাদেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূতের সংখ্যা এই মুহূর্তে বিপুল। এদেরকে ওই মহাদেশে ভারতের আর্থিক প্রকল্পে জুড়তে পারলে চীনকে রোখার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। কারণ চীনের প্রকল্পগুলি আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রনেতাদের খুশি করতে পারলেও তাতে আফ্রিকার জনগণের প্রত্যক্ষ লাভের সুযোগ সীমিত।

যেহেতু চীনা প্রকল্পগুলিকে কার্যকর করতে বেজিং তাদের দেশ থেকে অন্তত সাড়ে সাত লক্ষ চীনা শ্রমিককে পাঠিয়েছে আফ্রিকায়। তাই আফ্রিকার মানুষের নির্ভরতার জায়গাটা ভারত নিতেই পারে বলে সেই বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিমত। ভারতও আফ্রিকায় তার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিপুল বিনিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে চীনকে পিছু হটাতে বদ্ধপরিকর।

ইতিপূর্বে ২০০৮ ও ২০১১ সালে ভারত-আফ্রিকা ফোরামের দু'দুটি শিখর সম্মেলন হয়ে যায় যথাক্রমে নয়া দিল্লী ও আদ্দিস আবাবা-তে। পরবর্তীটা হবে আগামী পাঁচ বছর বাদে। এর মধ্যে ভারত তার কূটনৈতিক কৌশলকে আফ্রিকা মহাদেশে কতটা সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেদিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। ■

অক্লান্ত যোদ্ধা অশোক সিংহল

মালদহে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী। পাশে অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী।

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের সময় যাঁর হুঙ্কারে রামভক্তদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠত, সেই অশোক সিংহলজী সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করলেও যোদ্ধার মতো তেজস্বী ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন প্রচারক।

তাঁর জন্ম ১৯২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে উত্তরপ্রদেশের আগরাতে। সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। তাঁদের পরিবার আগে আলিগড় জেলার বিজৌলিতে ছিল। তাঁর পিতা মহাবীরজী উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন।

বাড়িতে সাধুসন্ত ও জ্ঞানীগুণীদের যাতায়াতের কারণে বাল্যকালেই হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। ১৯৪২ সালে প্রয়াগে পড়ার সময় অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ (রজ্জুভাইয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক) তাঁকে শাখায় আনেন। তিনি অশোকজীর মা বিদ্যাবতী দেবীকে সঙ্ঘের প্রার্থনা শোনান। এতে প্রভাবিত হয়ে তাঁর মা তাঁকে শাখায় যাওয়ার অনুমতি দেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ মেনে নিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় বসার জন্য আনন্দ উৎসব পালন করে। তখন দেশভক্তদের খুবই দুঃখ হচ্ছিল যে এই ক্ষমতালোলুপ নেতাদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে? অশোকজীর মনে এই বিষয়টি খুব পীড়া দিয়েছিল। তখন তিনি দেশের পরিবর্তনের জন্য নিজের জীবন দেশের কাজে সমর্পণ করার সঙ্কল্প করেন।

বাল্যকাল থেকেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁর রুচি ছিল। সঙ্ঘের বহু গানে তিনি সুর আরোপ করেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মেটালার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হন। ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘের সভায় নিষেধাজ্ঞা এলে তিনি সত্যাগ্রহ করে জেলে যান। ১৯৫০ তিনি প্রচারক হিসেবে নিজেকে সমর্পণ করেন।

প্রচারকরূপে তিনি সাহারানপুর, প্রয়াগ ও কানপুরে কাজ করেন। তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। কানপুরে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত রামচন্দ্র তিওয়ারীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হয়েছিল। এই দুজনের জীবনাদর্শ অশোকজীকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি জনমত সংঘটিত করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি দিল্লী প্রান্ত প্রচারক হন।

১৯৮১ সালে ড. করণ সিংহের নেতৃত্বে দিল্লীতে যে বিশাল হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল তার পিছনে অশোকজী ও সঙ্ঘই ছিল। তার পরেই তাঁর ওপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব আসে। একাত্মতা রথযাত্রা, সংস্কৃতি রক্ষানিধি, রামজানকী রথযাত্রা, রামশিলা পূজা, রামজ্যোতি ইত্যাদির, সফল রূপায়ণের জন্য বিশ্বহিন্দু পরিষদের কাজ সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। তাঁর নেতৃত্বে রামজন্মভূমি আন্দোলনের ফলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিই বদল হয়ে গিয়েছিল। তিনি ১৯৮২ থেকে '৮৬ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংযুক্ত মহামন্ত্রী, ১৯৯৫ পর্যন্ত মহামন্ত্রী, ২০০৫ পর্যন্ত কর্মাধ্যক্ষ, ২০১১ পর্যন্ত অধ্যক্ষ এবং শেষ পর্যন্ত সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাধুসন্তদের এক জায়গায় নিয়ে আসা কত কঠিন কাজ তা অশোকজী করে দেখিয়েছেন। তাঁর নম্র স্বভাবের জন্য বিভিন্ন মত-পথের লক্ষ লক্ষ সন্ত রামজন্মভূমি আন্দোলনের যুক্ত হয়েছেন। ওই সময় বহুবার অযোধ্যায় যাওয়ার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা এসেছিল, কিন্তু তিনি কোনো না কোনো ভাবে সেখানে পৌঁছে যেতেন। তাঁর সংগঠন কুশলতার কারণের লক্ষ লক্ষ যুবক ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতীয় কলঙ্কের প্রতীক বাবরি ধাঁচার পতন ঘটায়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজের জন্য তিনি প্রায় সমস্ত দেশে ভ্রমণ করেন। গত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও তিনি ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও আমেরিকা প্রবাস করেন।

ফুসফুসের সংক্রমণে তিনি গত ১৭ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। প্রতিদিন তিনি কার্যালয়ের পাশে শাখায় আসতেন। তাঁর প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি তখনই হবে যখন অযোধ্যায় বিশ্বের হিন্দুদের আশানুরূপ শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির নির্মাণ হবে। ▮

বাইশে বিশ্বরেকর্ড ভক্তির

সাঁতার কাটছেন ভক্তি শর্মা। উপরে মা লীনা শর্মার সঙ্গে।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কথায় আছে চেষ্টা থাকলে কিনা হয়। ভাবতে অবাক লাগলেও সাত-সমুদ্র পেরিয়ে আজ এই কথাটিকে সার্থক রূপ দিয়েছে ২২ বছরের এক তরুণী। মাত্র ২ বছর বয়সে শিশুরা যখন ঠিক মতো হাঁটতে পারে না তখন থেকেই সে সাঁতার কাটছে। ভক্তি শর্মা বিশ্বের কনিষ্ঠ সাঁতারু— শুনে কিছুটা অবাক হতে হয়। কেননা এই কনিষ্ঠ সাঁতারু সাত সমুদ্র পার হয়েছে। চারটি মহাসাগরও পার করেছে সে। বিশ্বের তৃতীয় সাঁতারু হিসেবে যে মেরুসাগর পার করেছে। এখন তাঁর লক্ষ্য ২০২০ সামার অলিম্পিকের স্বর্ণপদকটি লাভ করা। আর এজন্য সে প্রস্তুতিও শুরু করেছে।

মুম্বইতে জন্মগ্রহণ করলেও রাজস্থানের উদয়পুরে বেড়ে ওঠা ভক্তির। শৈশবের শুরুতেই তাঁর মা লীনা শর্মা তাঁকে স্থানীয় এক সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয়। শুরু হয় প্রশিক্ষণের প্রথম পর্ব। ভক্তির মা নিজেও একজন জাতীয় স্তরের সাঁতারু। তবে তাঁর জীবনের কিছু অপূর্ণ স্বপ্ন মেয়ের মাধ্যমে পূরণ হবে বলে তিনি আরও বেশি তৎপর। ভক্তি রাজস্থানের ৮ বারের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। ১৪ বছর বয়সে তার মা-ও সাঁতার কাটতে শুরু করেন। মা লীনা শর্মাই তাঁকে ছোটবেলা থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। এইভাবে উদয়পুরে নিয়মিত সাঁতারের প্রশিক্ষণ নিতে নিতে মা এবং মেয়ে দু'জনেই ৭২ কিলোমিটার আরব সাগর পার করেছিলেন মাত্র ১৮ ঘণ্টায়, যে রেকর্ড আজ পর্যন্ত কেউ ছুঁতে পারেনি। এছাড়া ২০১২ সালে ভক্তি তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কারও পান ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে। ভক্তি এবং তাঁর মা লীনা শর্মা দু'জনেই ইংলিশ চ্যানেল পার করে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছে। ২০০৮ সালের ১৩ জুলাই তাঁরা প্রথম চেষ্টা করে ইংলিশ চ্যানেল পার করতে। ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স যাওয়ার মুখে ইংলিশ চ্যানেলে অত্যধিক হাওয়া এবং ঢেউ থাকার কারণে তাঁরা সাঁতার বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এর ১০ দিন পর অর্থাৎ ২৩ জুলাই ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল পার করে। এ প্রসঙ্গে লীনা শর্মা জানান, 'ইংলিশ চ্যানেল পার করা আমাদের দু'জনের কাছে স্বপ্ন ছিল। আমরা তা করতে পেরে খুবই আনন্দিত।' মূলত ভক্তির এই সাফল্যের পিছনে তার বাবা-মায়ের ত্যাগ অস্বীকার করা যায় না। ভক্তির এবং নিজেদের স্বপ্ন পূরণের জন্য লীনা শর্মা ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন। এমনকী তাঁর বাবা চন্দ্রশেখর শর্মা পেশায় ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক ঋণ নিতে হয়। কারণ ইংলিশ চ্যানেল পেরোতে গেলে যে ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে হয় তা খুবই ব্যয়বহুল মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে। ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতারের পোশাকের দাম ১২ লক্ষ টাকা। ইংলিশ চ্যানেল পার করার আগে টানা একমাস চার ঘণ্টা করে মা মেয়ে দু'জনে নিয়ম করে নিত্য অনুশীলন করতেন। তার ফলস্বরূপ তাঁরা ইংলিশ চ্যানেল পার করে রেকর্ড বুকে নামও তোলেন।

তবে এখানেই থেমে থাকেনি ভক্তির উৎসাহ। ২০১০ সালে সে আইসল্যান্ড যায় মেরুসাগর পার করতে। কিন্তু এই সাগর খুবই ভয়ানক। প্রথমত, এই সাগরের জলের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে ঘোরাফেরা করে। দ্বিতীয়ত, এই মেরু সাগরে হাঙ্গর জাতীয় ভয়ঙ্কর জলজন্তুতে পূর্ণ। এসব সত্ত্বেও ৯ নভেম্বর ২০১৫-তে বিশ্বের তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে এই সাগর পার করেন ভক্তি। এছাড়াও ২০০৭ সালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে মেক্সিকোর উপসাগর পার করেন। এরপর একে একে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর সাঁতরে পার হন ভক্তি। তবে প্রত্যেকটি সাঁতার অভিযানে তাঁর মা বরাবর পাশে ছিলেন এবং সাহস জুগিয়েছেন। কারণ তিনি নিজেও একজন সাঁতারু। তিনি বোঝেন একজন সাঁতারুর কী কী প্রয়োজন। আর সেটা বুঝেই তা কাজে লাগিয়েছেন লীনা শর্মা। নিজে একজন স্পোর্টসম্যান বলে তিনি তাঁর মেয়ের মধ্যেও সেই আচরণ দেখতে চান। ভক্তিও তাঁর মায়ের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নকে সফল করে তুলতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

ভক্তি যখন ১.৪ মাইল মেরুসাগর পার করেন মাত্র ৫২ মিনিটে তখন আরও এক বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন হলো। এই নয়া কৃতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে অভিনন্দনও জানান। তাঁর বাবা-মা এবং ভাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি হন ২০১৫-এর ২৭ এপ্রিল। মোদীজী তাঁকে এবং তাঁর মাকে অভিনন্দন জানান এই অভাবনীয় কৃতিত্বের জন্য। যা পরবর্তীকালে তা আরও এক নতুন রেকর্ড তৈরিতে সাহায্য করবে ভক্তিকে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

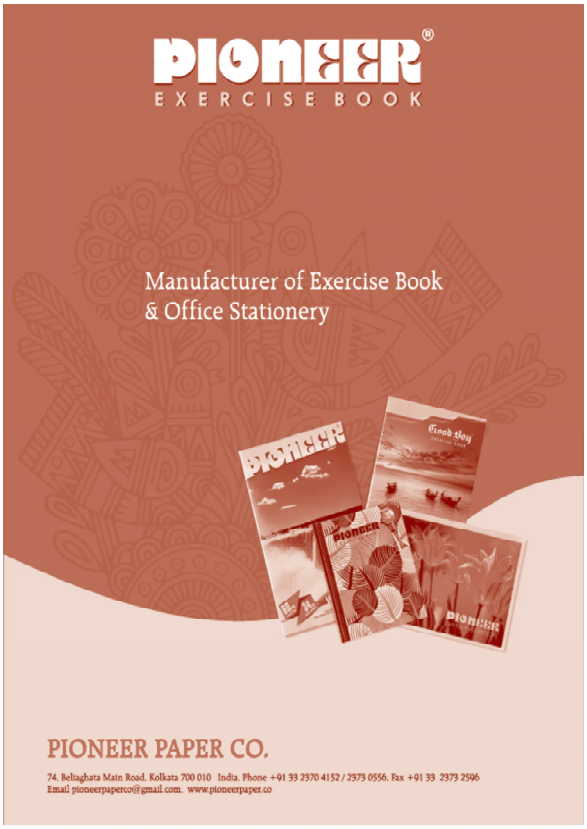

‘ শিক্ষার আওতায় অনেক কিছু এসে পড়ে। শিক্ষা দেবার বিশেষ পদ্ধতি, বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয়, এক কথায় মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, এ সবই শিক্ষার পরিধিতে পড়ে।

সকল শিক্ষার পরিসমাপ্তি স্বাধীনতায়

শিক্ষার বিস্তার কখনো সমালোচনা বা নিরুৎসাহ দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। শিক্ষার্থীর মধ্যে মহদ্‌গুণ যিনি দেখতে পান, তিনিই যথার্থ শিক্ষক হতে পারেন।

কেবলমাত্র ভারতীয় জীবনের মহত্ত্বের মাধ্যমেই আমরা ভারত বহির্ভূত বিশ্বের মহত্ত্বের আভাস শিক্ষার্থীকে দিতে পারি।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

মুকুন্দরাও পানশীকরের স্মরণ সভা

সমাবেশ সমাচার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের অখিল ভারতীয় প্রমুখ মুকুন্দরাও পানশীকরের স্মরণ সভা গত ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতার কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্য বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী সঙ্ঘের প্রচারক জীবন দেশের প্রতি সর্মপণের জন্য সব দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কাজ করার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেন। তারই একজন উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন মুকুন্দরাওজী।

প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে তাঁকে চিনতেন। তার সংগঠনকুশলতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। প্রবীণ প্রচারক কেশবজী তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয়ের কথা বলেন। কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও বাংলায় তাঁর প্রবাসের সময় দেখা সমাজের অনেক ব্যক্তির উল্লেখ করেন। আমাদের জন্য সর্মপিত জীবনের উজ্জ্বল উদাহরণ রেখে গেলেন।

পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী সদ্য ঝাড়খণ্ডের রাচীতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। ট্রেনে যেতে যেতেই কর্মপথে তাঁর জীবনাবসান হয়।

অখিল ভারতীয় খণ্ড সভার পক্ষ থেকে আগামানন্দজী মহারাজ ও কুলদানন্দ মহারাজ শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন। সবশেষে ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ সনাতন মাহাতো বলেন— তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন লেখক। বহু বিষয়ে প্রতিভাবান ছিলেন তিনি। মা নর্মদা সামাজিক কুম্ভ-এর সফল আয়োজন ও সদ্য অনুষ্ঠিত নাসিক কুম্ভের বিশাল আয়োজনে তাঁর কর্মদক্ষতার কথা তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রান্তসংযোজক দেবপ্রসাদ ঘোষ।

বাঁকুড়ায় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

গত ২৯ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দশ দিন ধরে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী থানার কাপিস্টা গ্রামে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সংস্কৃত ভারতীর সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির। দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কাপিস্টা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অম্বিকা প্রসাদ মণ্ডল। শিবিরে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থী। প্রতিদিনই এক এক জন বিশিষ্ট অতিথির দ্বারা দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের কার্যক্রম শুরু হয়। শিবিরে বিভিন্ন দিনে উপস্থিত বিশিষ্ট জনের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থসারথি শীল, রামপুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক তথা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার সভাপতি সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাণীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েক, শিক্ষক সৈকতকুমার কান্ত, কিশোর শেঠ, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক গুরুপদ উপাধ্যায় প্রমুখ।

শিবিরের শিক্ষিকা কুমারী সুভদ্রা দত্তের কুশলী শিক্ষাদানে অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে শেখে এবং চতুর্থ দিনের পর থেকেই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে নিজেদের ভাবপ্রকাশে কিঞ্চিৎ সক্ষম হয়। শিবিরের অন্তিম দিনে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করে এবং নিজেদের ভুলত্রুটিগুলি বেশ মজার সঙ্গেই উপভোগ করে। ৭ নভেম্বর ছিল শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয়ের সভাপতি গোপালশরণ দ্বিবেদী, সংস্কৃত ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ, বিশিষ্ট নাগরিক হৃদয়মাধব দুবে, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সন্ত সিংহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহ, সমাজসেবী প্রবীর দুবে ও সোমনাথ দুবে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশনে দর্শকরা মুগ্ধ হন। সংস্কৃত ভাষণ শিক্ষার্থীদের উদ্দীপ্ত করে। সন্ত সিংহ সংস্কৃত গ্রন্থরাজিতে নিহিত প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐতিহ্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। সংস্কৃত প্রচার ও প্রসারের জন্য এরকম শিবির বারবার করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উল্লেখ করেন। শ্রী দ্বিবেদীর মাত্র দশদিনের প্রয়াসে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতে কথা বলার সামর্থ্য অর্জনে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং শিক্ষিকা সুভদ্রা দত্তকে সাধুবাদে জানান। সকলেই এই শিবিরের উদ্যোক্তা এবং বিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক সুখময় মাজীর উদ্যোগের প্রশংসা করেন ও সংস্কৃত ভারতীর বিস্তার কামনা করেন। দশদিন ব্যাপী এই শিবিরের ব্যবস্থাপনা ও অতিথি আপ্যায়নের যাবতীয় গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী গৌতমকুমার দাস। এই শিবির এলাকায় ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার করে। শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতভাষা চর্চার জন্য একটি স্থায়ী সংস্কৃত পাঠচক্র স্থাপনের অঙ্গীকার করে।

সন্ত সীতারামজীর পরিক্রমা

গত ১১ অক্টোবর পদব্রজে ভারত পরিক্রমারত সন্ত সীতারামজী পুরুলিয়া শহরে পদার্পণ করলেন। পোদলাড়া গ্রাম থেকে পদব্রজে পুরুলিয়া শহরে সকাল এবং পরে সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম লাগদাতে পৌঁছন। সেখানে সারাদিন গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে গ্রাম উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের পরিবারকে সুস্থ ও শান্তিতে থাকার বিধান দেন।

বিকেলে ওই গ্রামের সর্বজনীন দুর্গামন্দিরে গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতি বিশেষ আবেদন রাখেন।

পুরুলিয়ায় সমাজসেবা ভারতীর বস্ত্র বিতরণ

পুরুলিয়া জেলার আদ্রানগর সেবাভারতীর উদ্যোগে সেবা ভারতীর জেলা সদর ভবন 'সেবাতীর্থ'-এ গত ১৭ অক্টোবর সমাজের দুঃস্থ শিশু, বালক ও মায়েদের দুর্গাপূজা উপলক্ষে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পূজার আনন্দ সকলে যাতে অনুভব করতে পারে সেজন্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রায় ৩০ জন শিশু ও বালক এবং পাঁচজন মা-বোনদের নতুন বস্ত্র হাতে তুলে দেন সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক মানিকলাল মল এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী কানাইলাল রাঠী।

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের বিজয়া সম্মেলন

সম্প্রতি দুর্গাপুর সেবা বিভাগের সেবা কেন্দ্রগুলিতে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মোট ৭টি স্থানে এক বা একাধিক সেবা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উৎসাহপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও ডাকা হয়।

সেবা সংস্থা বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে দুর্গাপুর নগরের একটি সভাগৃহে সংস্থার সদস্য, কার্যকর্তা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে সাতটি স্থানে বিপুল উদ্দীপনায় বিজয়া সম্মেলন পালিত হয়।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'গীতা ও ভারতীয় শিক্ষায় বন্দেমাতরম্' নিয়ে আলোচনা সভা

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'গীতা এবং ভারতীয় শিক্ষায় বন্দেমাতরম্'। গত ৭ নভেম্বর নন্দন চত্বরে বাংলা আকাডেমি প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মূলত ছাত্রসমাজকে সামনে রেখেই এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। এই আলোচনা চক্রে অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জয়নারায়ণ সেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ এবং অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধর।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দের কথায় উঠে আসে হিন্দুধর্মে গীতার প্রভাবের কথা। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতার অহিংস নীতির উল্লেখ করে জয়নারায়ণ সেন বলেন, উপনয়নের ক্ষেত্রে যে বয়সসীমা নির্দিষ্ট করা আছে ঠিক সেই সময় থেকেই গীতাপাঠে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'কড়া নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে চলা উচিত। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস থাকা উচিত।' এছাড়াও একের পর এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। আবার এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হো চি মিন এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের কথোপকথন তুলে ধরেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, কট্টর বামপন্থী হওয়া সত্ত্বেও হো চি মিন শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেকথা বিধানচন্দ্র রায়কে জানানও। বামপন্থীরা যেখানে নিজেদের নাস্তিক বলে ব্যাখ্যা করেন সেখানে হো চি মিনের মতো বামপন্থী হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছিলেন। আবার তাঁর কথাতেই উঠে আসে নেহরু নিজেকে দুর্ভাগ্যবশত হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন সে প্রসঙ্গটিও। গীতা প্রসঙ্গে এই বিশিষ্ট সাংবাদিক মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত ভারতকে গীতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। তাই এই গীতাকে অস্বীকার মানে শাশ্বত ভারতকে অস্বীকার করা। এদিনের সভায় সকলের মন্তব্যে একটি বিষয় পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত দেশজননীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। যদিও নেহরু পন্থীরা সেটিকে দেশবিরোধী আখ্যা দিতেও পিছপা হয়নি। তাই যারা বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সঙ্গীত করতে দেয়নি তারাই গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে মানতে রাজি নয়। তাঁদের শরীর এদেশে, মন রয়েছে চীন-রাশিয়াতে। ভারতের হৃদয় যে গৈরিক তা মানতে কুণ্ঠাবোধ করেন নেহরুপন্থীরা। ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ ভগবান কথাটির সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যেই বিশ্ব প্রকৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ভ-ভূমি, গ-গগন, ব-বায়ু, অ-অগ্নি এবং ন-নীড়। অর্থাৎ পঞ্চভূত যা দিয়ে এই সৃষ্টি। তাই তাকে কখনই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ভগবান এক এবং অবিনশ্বর। তবে পুলকনারায়ণ ধর দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, পাঠক্রমের মধ্যে ভারতের প্রাচীনত্বকে তুলে ধরা উচিত। রামায়ণ-মহাভারতকে পাঠক্রমে আনা উচিত। তিনি আরও বলেন, গীতায় কর্মযোগের কথা উল্লেখ আছে। তাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কথা না ভেবে সমাজের কথা ভাবা উচিত। আর বন্দেমাতরমে কোনো মুসলমান বিরোধী কথা নেই। মূলত এই সঙ্গীতকে ধরে রাজনীতি করেছিল নেহরুপন্থী ও বামপন্থীরা।

এই দিনের অনুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁরা প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য একবাক্যে স্বীকার করেন।

শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস-এর জাতীয় অধিবেশন

'শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস'-এর জাতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বারুইপুরের সত্যানন্দ মহাপীঠে। এই সম্মেলনের সূচনা করেন অধ্যাপিকা রেণু মাথুর। দু'দিন ব্যাপী চলা এই অধিবেশন জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া এবং বিভিন্ন নীতি প্রণয়ণের উপর আলোচনা হয়। এছাড়াও ভাষানীতি এবং ইউপিএসসি পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পৌরোহিত্য করেন শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাসের কেন্দ্রীয় সম্পাদক অতুল কোঠারী। অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দেন আচার্য কমলাকান্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী দিব্যাত্মানন্দ মহারাজ। এছাড়াও ড. পঙ্কজ মিত্তাল (ইউজিসি-র অতিরিক্ত সচিব), ড. সুরেশ ট্যান্ডন (পাঞ্জাবের সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান), ড. প্রেমলতা চুতাল (উজ্জয়নের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু বিভাগের প্রধান) প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি ও বৈদিক গণিত ও নীতিশিক্ষার বিষয়টি জোর দেন।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও পানীয় জল পরিষেবা

আদ্রানগর সেবা ভারতী পুরুলিয়া উদ্যোগে গত ১৭ ও ১৮ নভেম্বর স্থানীয় সাহেব বাঁধের তীরে অবস্থিত সূর্য মন্দিরে ছটপূজা উপলক্ষে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পানীয় জল পরিষেবা শিবির করা হয়। ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ মনোজ কুমার, বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত কুমার দে, নগর সঙ্ঘচালক সুরেশ লাট, জেলা সেবা ভারতীর সম্পাদক সুনীল চন্দ্র কর, সেবা ভারতীর চিকিৎসা প্রমুখ শঙ্কর কাশ্যপ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডে, খোকন সরকার, শ্রী বদ্রীনারায়ণ পাণ্ডে প্রমুখ। এই শিবির থেকে প্রায় ১০০০ জন ভক্তকে বিশুদ্ধ পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া হয়। ছট সমিতি, পুরুলিয়া শিবিরের জন্য সূর্য মন্দির পরিসরের মধ্যেই তাঁবু তৈরি করিয়ে দেন।

Swachchha Bharat
Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

বিশ্ব হকি লিগ ভারতের অগ্নিপরীক্ষা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব অলিম্পিকের আগে ভারতের হকি দল শেষবারের মতো একটি বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছে। ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ওয়ার্ল্ড হকি লিগ ফাইনাল পর্বের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এমাসের ২৭ তারিখ থেকে। দশদিনের এই টুর্নামেন্টে বিশ্বের সেরা আটটি দেশ অংশগ্রহণ করছে। ভারতের গ্রুপে খেলবে নেদারল্যান্ড, জার্মানি ও আর্জেন্টিনা। অন্য গ্রুপে আছে অস্ট্রেলিয়া, গ্রেটবৃটেন, নিউজিল্যান্ড ও বেলজিয়াম। অত্যন্ত উঁচুমানের এই টুর্নামেন্টে সর্দার সিংহের নেতৃত্বাধীন ভারত কী করে তার দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দেশ। আর টুর্নামেন্টে ভাল খেলার ব্যাপারে আশাবাদী স্বয়ং অধিনায়ক। কারণ বেঙ্গালুরুর সাই ক্যাম্পে প্রায় একমাস প্রস্তুতি নিয়েছে ভারতীয়রা। মাঝে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট সিরিজও খেলেছে।

অ্যাটোর্য়াপে গত জুনে বেলজিয়ামে এই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বিশ্রী ফল করে ভারত। গ্রেটবৃটেন ও বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি ভারতীয়রা। বাকি দলগুলির বিরুদ্ধে ছন্দবদ্ধ হকি খেলেছিল। তবে ওই আসরে দলের ২—৩ জন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিল না। না হলে ফলাফল আর একটু ভাল হোত। ইদানীং ভারতীয় হকি এক পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু তরুণ খেলোয়াড়কে জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলগঠন থেকে কোচিংস্টাফ নির্ধারণ সব কিছুতেই নতুন ভাবনা চিন্তা আমদানি করা হয়েছে। সম্প্রতি একজন কোচকে নিয়ে আসা হয়েছে বিশেষ ধরনের ট্রেনিং করানোর জন্য। আর বোলান্ট অল্টম্যানকে হাই পারফরমেন্স ডিরেক্টর করে গোটা দলের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই ডাচ বিশেষজ্ঞ টিমে আসন্ন টুর্নামেন্টে ভারতকে কোন জায়গায় নিয়ে যান এখন সেটাই দেখার।

তবে হকি ইন্ডিয়ার উচিত ছিল সাইয়ের পরামর্শ মেনে বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান টেরি ওয়ালশকে পুনরায় চিফ কোচ হিসাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। ওয়ালশ নিজে বিরাট খেলোয়াড় ছিলেন। কোচ হিসেবেও ধুরন্দর। তার কোচিংয়ে ভারত গত বছর এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছে। বিশ্ব সেরা অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশের মাঠে টেস্ট সিরিজে হারিয়ে এসেছে। কর্তাদের সঙ্গে সামান্য দু-একটি বিষয়ে মতবিরোধ হওয়ায় ভারত ছেড়ে চলে যান। সাই কর্তারা মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইলেও হকি ইন্ডিয়ার একগুয়েমি মনোভাব ওয়ালশকে ফিরতে দেয়নি। ফলে ভুগতে হচ্ছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের। ভারত ওয়ালশের কোচিংয়ে অনেক স্বচ্ছন্দে যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটা সেট প্যাটার্ন তৈরি করে পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে পেরেছিল। নতুন কোচ আসার পর তালগোল পাকিয়ে যায়। তাই পরবর্তী পর্যায়ে মালয়েশিয়ার সুলতান আজলান শাহ টুর্নামেন্ট এবং বেলজিয়ামের ওয়ার্ল্ড হকি লিগ সেমিফাইনালে প্রত্যাশিত ফল হয়নি। একথা 'ঠারে ঠোরে সর্দার সিংহ স্বীকারও করেছেন। এছাড়া হকি ইন্ডিয়ার নির্বাচক কর্তাদের দলগঠন প্রক্রিয়াও নিখুঁত হচ্ছে না। কোন অজুহাতে সন্দীপ সিংহের মতো 'ড্রাগ ফ্লিকারকে দলের বাইরে রাখা হয়। রক্ষণভাগ শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি সর্টকর্নার থেকে গোলের সুযোগও তৈরি হোত সন্দীপ টিমে থাকলে। কেডি রঘুনাথ ভাল সর্টকর্নার মারে। কিন্তু সন্দীপের সমতুল্য নন। আর আক্রমণভাগে রাজপাল সিংহের মতো একজন 'লিডার' দরকার ছিল। এস ডি সুনীল, মননদ্বীপ সিংহ, দানিশ মুজতবারের মতো অনভিজ্ঞ ফরোয়ার্ডদের গাইড করে সেরা খেলাটা বের করে আনতে পারতেন। সন্দীপ ও রাজপালের মতো দুই বিশ্বমানের খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করলে ভারতের খেলার ধার ও ভার দুইই বেড়ে যেত। বর্তমান দলটিতে অভিজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক বড় মঞ্চে দায়িত্ব নিয়ে সেরা খেলা তুলে ধরার মত খেলোয়াড় আছেন গোলকিপার থ্রী জেমু, অধিনায়ক তথা মিডফিল্ডার সর্দার সিংহ ও উইং হাফ রামনদীপ সিংহ। তাই এই দলের কাছে ওয়ার্ল্ড হকি লিগ ফাইনালে পদকপ্রাপ্তির আশা করা বোধহয় ঠিক হবে না। আর যেহেতু এই টুর্নামেন্ট পরের বছরের বিশ্ব অলিম্পিকের 'ড্রেস রিহার্সাল', তাই ন'বারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নদের পোডিয়াম ফিনিশও দেখা যাবে না। যদি না বেশ কিছু বড় মাপের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হয়। তার সঙ্গে ওয়ালশকেও ফিরিয়ে আনতে হবে। ▮

শব্দরূপ-৭৬৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

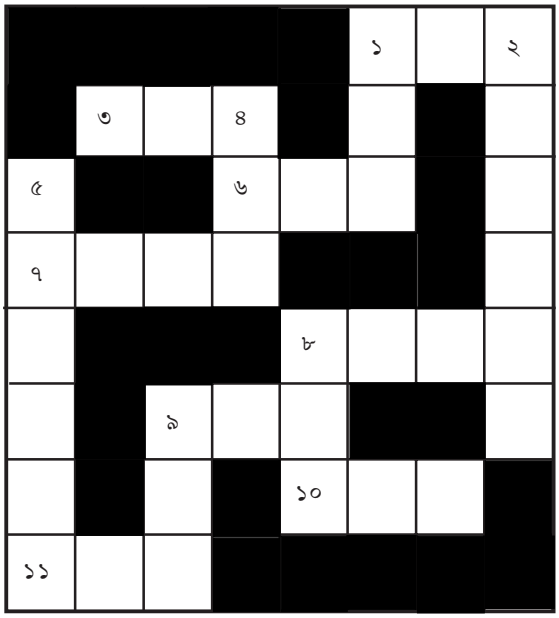

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বালীর পুত্র, **৩.** বৃষ্ণিবংশীয় পরমভক্ত; শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, **৬.** সাকল্য, মোট, **৭.** '—তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারেবারে/ দয়াহীন সংসারে', **৮.** ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা, **৯.** গ্রীষ্মকাল, **১০.** সমুদ্রের অধিপতি দেবতা, **১১.** ব্যাধ শ্রেণীর একটি জাতি।

উপর-নীচ : ১. মৃতসৎকার, **২.** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই নামে সমধিক পরিচিত, **৪.** '—পরো মা'; বস্ত্র, পরিধেয়, **৫.** শঙ্করাচার্যের প্রতিযোগী মণ্ডণমিশ্রের বিদুষী ভার্যা, **৮.** রঘুবংশীয়; রাম, **৯.** ঝরণা, উৎস।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬৫
সঠিক উত্তরদাতা

পার্থ সেন
মালদা, পুরুলিয়া
পীযূষ বর্মন
জামালদহ, কোচবিহার

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৬৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৮

কয়েক মাস পরে। রাজা রাজ্যের দক্ষিণ অংশ সফরে গেলেন। অন্ধকার হয়ে এলে এক নদীর ধারে শিবির ফেলা হল।

পরের দিন সকালে যখন যাত্রার আয়োজন চলছে—

এক দূত রাজার কাছে ছুটে এল—

ক্রমশঃ

রাখে হরি মারে কে

একবার নয় দু' দুবার প্রবল জঙ্গি হামলার হাত থেকে বেঁচে ফিরলেন ম্যাথ নামের এক আমেরিকান নাগরিক। নিজের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ারের বিস্ফোরণের সময় তিনি ছিলেন ট্রেড সেন্টারের নীচের রাস্তায়। হামলার আকস্মিকতায় প্রাণ বাঁচাতে তিনি দীর্ঘ ম্যানহাটন সেতু প্রায় আধঘণ্টা দৌড়ে পার করেন। গত ১৩ নভেম্বরের প্যারিসের বাটাক্লান (Bataclan) সঙ্গীত সভাঘরে আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলার সময়ও তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ছিলেন একেবারে হলের উত্তর দিকে। এবারে জঙ্গিদের গুলি লাগে তাঁর পায়ে। মরার ভান করে দীর্ঘক্ষণ পড়েছিলেন তিনি। আতঙ্কে দীর্ঘ চেষ্টায় মাত্র কয়েক মিলিমিটার করে শুয়ে শুয়ে এগিয়ে তিনি জনৈক উদ্ধারকারীর নজরে পড়েন। ঘটনার দীর্ঘক্ষণ পরে এই বীভৎসতার কথা হাসপাতাল শয্যায় জানান ম্যাথ। সত্যিই রাখে হরি মারে কে!

মপেড না সাইকেল

হল্যান্ডে শুধু সাইকেল আরোহীদের জন্য ২২ হাজার মাইল রাস্তা সংরক্ষিত আছে। এই পথে অন্য কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন চলা নিষিদ্ধ। রাস্তায় সাইকেলের গতি গড়ে ৩০ কিলোমিটার। সম্প্রতি সমস্যা দেখা দিয়েছে এই রাস্তায় মপেডের অনুপ্রবেশের কারণে। সূত্র অনুযায়ী শতকরা মাত্র ১ শতাংশ যাত্রার ক্ষেত্রে মপেড ব্যবহৃত হলেও প্রতি ৬টি পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ১টি মপেড আরোহীদের কারণে ঘটে। তাই দূষণহীন সাইকেল না মপেড তা নিয়ে এখন হল্যান্ড সরগরম।

উবাচ

উত্তরপ্রদেশের সাইফাইতে বিপুল সমারোহে মুলায়ম সিং-এর ৭৬তম জন্মদিন উৎসবে এসেছিলেন দলের পূর্বতন বর্তমানে বহিষ্কৃত সাংসদ অমর সিং। তাঁর বিরোধী মন্ত্রী আজম খান এই উপলক্ষে বলেন 'নেতাজীর জন্মদিনে বন্যার মতো লোক এসেছিল। এর সঙ্গে অনেক আবর্জনাও এসে জড়ো হয়েছিল। কি করা যাবে?"

মালেয়েশিয়ার মাটিতে উন্মোচিত স্বামীজীর মূর্তি

মালেয়েশিয়ায় আয়োজিত আসিয়ান বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনদিনের সফরে এসে ২১ নভেম্বর পেটালিং জয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মূর্তিও উন্মোচন করেন তিনি। স্বামীজীকে সত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন 'ওয়ান এশিয়া'— ধারণা স্বামী বিবেকানন্দের মস্তিষ্কপ্রসূত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম 'ওয়ান এশিয়া'র ধারণা দিয়েছিলেন।' মোদীজীর বক্তব্যে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিষয়টিও উঠে এসেছে। তিনি বলেন, ''আমরা (ভারতীয়রা) গাছ, পশু-পাখিদের মধ্যেই ভগবানকে কল্পনা করি। এর দ্বারা আমরা প্রকৃতিকে রক্ষা করার সুযোগ পেতে পারি যা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।"

পুরুলিয়ার বরাবাজারে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে জেহাদি হামলা

পুরুলিয়া জেলার ঝাড়খন্ড লাগোয়া বরাবাজার ব্লকে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের শোভাযাত্রায় হঠাৎ করেই মুসলমানরা লাঠি তরোয়াল নিয়ে আক্রমণ চালায়। খুব তড়িঘড়ি এলাকার হিন্দুরা একজোট হয়ে প্রতিরোধ শুরু করে। পুলিশ বেছে বেছে হিন্দুদের গ্রেপ্তার করে। একজন মুসলমানকেও গ্রেপ্তার করেনি। হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে এবং হিন্দু জনতার ওপর লাঠি চার্জ করে। পুলিশকর্তারা হিন্দুদের সঙ্গে শান্তি বৈঠক করার জন্য বরাবাজার থানায় এসে পৌঁছায়। দফায় দফায় বৈঠক করার পর পুলিশ গ্রেপ্তার হওয়া হিন্দু ছেলেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এলাকার হিন্দুদের বক্তব্য এখানে হিন্দু মুসলমান দীর্ঘদিন ধরে শান্তিতে বসবাস করছে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে তৃণমূলের মদতে মুসলমানরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, বর্তমান শাসকদলের মদতেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকছে।

আর্যভট্ট গুরুকুল বিদ্যালয়— একটি বৈদিক আবেদন

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি তথা বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য বীরভূমের শান্তিনিকেতনের পাশেই ৩০ বিঘা জায়গার উপর একটি বাংলা মাধ্যম ও একটি ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ও একটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই কাজ শেষ করতে এখনও ৮৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

সকল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, প্রত্যেকেই যদি নিজেদের সাধ্যমত সাহায্য করেন তবে এই কাজ সহজেই হতে পারে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শান্তিনিকেতন শাখার ১০৫৯৮৫৪৪০৬৯ -এই এ্যাকাউন্ট নম্বরে যে কোনো অর্থ সাহায্য করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গা থেকে ফোন করলে আমরা ব্যক্তিগতভাবেও সংগ্রহ করতে পারি।

এছাড়াও কেউ যদি তার পরলোকগত বাবা, মা, আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতিতে একটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করে দেন তবে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। এর জন্য খরচ মাত্র দেড় লক্ষ টাকা।

এছাড়াও স্কুলে ব্যবহার করা যাবে এমন পুরনো অথবা নতুন আসবাবপত্র, বই অথবা যে কোনো জিনিস কেউ দান করেন তবে তাও সাদরে গৃহীত হবে।

সকল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সহযোগিতা কাম্য।

বিনীত,

সম্পাদক, আর্যভট্ট গুরুকুল বিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

মোবাইল : ৯১৫৩২৬০১৬০

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
30 November - 2015 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

Wide beam angle for better light spread

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

দাম : ১০.০০ টাকা